বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ
গতি-প্রকৃতি ও প্রভাব

পেপার ৫৭

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

মূল্য - ৫০.০০

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ
বাড়ি নং ৪০/সি, সড়ক নং-১১ (নতুন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ডাক যোগাযোগ: জিপিও বক্স নং-২১২৯, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৮১২৪৭৭০; ফ্যাক্স: ৮১৩০৯৫১; ই-মেইল: cpd@bdonline.com
ওয়েবসাইট: www.cpd-bangladesh.org

ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রকাশক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ী ৪০/সি, রোড ১১
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮০ ২ ৯১৪৫০৯০, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩
ফ্যাক্সঃ ৮৮০ ২ ৮১৩০৯৫১
E-mail: cpd@bdonline.com
Website: www.cpd-bangladesh.org

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
স্বত্ব © সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

মূল্য
টাকা ৫০.০০

ISSN 1818-1570 (Print)
ISSN 1818-1597 (Online)

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হল একটি জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে সিপিডি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সংলাপ আয়োজনসহ বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড সংগঠিত করে আসছে।

সিপিডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে নিয়মিত সংলাপ পরিচালনা করে থাকে যার মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে মুক্ত আলোচনার স্বপক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিপিডি সবসময় সচেষ্ট। এসব সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিপিডি বাংলাদেশের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সিপিডি সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও পেশাজীবী জনগণ, ব্যবসায়ী মহল, জনপ্রতিনিধি, নীতিনির্ধারকবৃন্দ, সরকারী আমলা, উন্নয়ন-অংশীদারসহ বিশেষজ্ঞগণ, তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের নেতৃবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গ্রুপসমূহকে নিয়ে নিয়মিত নীতি-সংলাপ আয়োজন করে থাকে। সিপিডি-র লক্ষ্য হল এ ধরনের সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সব নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেগুলোর পক্ষে ব্যাপক জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলা। বিগত সময়ে এ সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে সিপিডি একটি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ও সুশীল সমাজের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সংলাপ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিপিডি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। এ গবেষণাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা (আই.আর.বি.ডি.) অন্যতম। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চলমান গবেষণা কর্মসমূহের মধ্যে আছে বানিজ্য নীতি বিশ্লেষণ ও বিশ্ববানিজ্য সংস্থা (ডব্লিউ,টি,ও) - এর প্রভাব পরিবীক্ষণ, দক্ষিন এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ ও উদ্যোগের প্রসার, সুশাসন ও উন্নয়ন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি। এসব গবেষণা সিপিডি-র সংলাপ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধতর করছে। সিপিডির অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে নীতি ইস্যু ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে জনমত জরিপ পরিচালনা এবং নবীণ/তরুণদের নেতৃত্বদান।

সিপিডি-র গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া। এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য সিপিডি-র একটি সক্রিয় প্রকাশনা কর্মসূচীও (বাংলা ও ইংরেজি) রয়েছে। এ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সিপিডি নিয়মিতভাবে 'সিপিডি সাময়িক পত্রাবলী' (CPD Occasional Paper Series) প্রকাশ করে থাকে। সংলাপের পটভূমি পত্র, অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন ও বৃহত্তর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জনমতামত জরিপ ফলাফল এ সিরিজের অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ: গতি-প্রকৃতি ও প্রভাব শীর্ষক বর্তমান সাময়িক পত্রটি সিপিডি'র "বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা (আই.আর.বি.ডি.)" বিষয়ক প্রোগ্রামের আওতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। সাময়িক পত্রটি প্রস্তুত করেছেন সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং গবেষণা ফেলো খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

সহকারী সম্পাদক : *আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ*, প্রধান, ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগ
সিরিজ সম্পাদক : *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য*, নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি।

সূচি

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	
১. ভূমিকা	১
২. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের নীতি কাঠামো	২
৩. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী	৭
৪. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ	৯
৫. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের কাঠামো ও উৎস	১১
৬. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের খাতভিত্তিক বণ্টন	১৩
৭. অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাব	১৪
৮. বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ	১৯
৯. মানসম্পন্ন বৈদেশিক বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য	১৯
১০.টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব পর্যালোচনা	২১
১১.উপসংহার	২৫
গ্রন্থপঞ্জি	২৬
পরিশিষ্ট: বৈদেশিক বিনিয়োগ বিষয়ে সিপিডি'র প্রকাশনা	২৭

মুখবন্ধ

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতিতে কতটুকু ভূমিকা রাখছে বা ভবিষ্যতে তা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারবে? সরকারের নীতি নির্ধারকদের মধ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগকে ''অতি সরলীকরণ'' করে প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে দেখানোর প্রবণতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা নির্ভর করে তার পরিমাণ, খাত ভিত্তিক বণ্টন, অর্জিত মুনাফার ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, রপ্তানীমুখী শিল্পে বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের উপর।

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগের কোনো নজির নেই। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেশে খুব স্বল্প পরিমানে বৈদেশিক বিনিয়োগের মজুদ ছিল, এবং আশির দশকে এসেও তা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এর প্রণোদনায় ''কাঠামোগত সংস্কার'' এর আওতায় বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ উন্মুক্ত করা হলেও নব্বই দশকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত দেশে খুব বেশী বিনিয়োগ আসেনি। আশির দশকে গড়ে বার্ষিক বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ০.৩ কোটি ডলার, যা নব্বই দশকে বেড়ে দাঁড়ায় ৮.৩ কোটি ডলার। সাম্প্রতিককালে বৈদেশিক বিনিয়োগ কিছুটা বেড়েছে - ২০০৩ সালে তা ছিল ৩৫ কোটি ডলার, ২০০৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৬ কোটি ডলার। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বর্ধিত এ বিনিয়োগের বেশীর ভাগই মূলধন নির্ভর, সেবাখাতমুখী তেল ও গ্যাস উত্তোলন এবং টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োজিত রয়েছে। এসব বিনিয়োগ বাদ দিলে শ্রম নির্ভর, রপ্তানীমুখী খাতের কাংখিত বিনিয়োগ খুব বেশী নয়। উপরন্তু অধিকমাত্রায় অর্জিত মুনাফা বিদেশে প্রত্যাবাসনের ফলে দেশের বৈদেশিক লেনদেন হিসাবে চাপ পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে ভারতের বহুজাতিক কোম্পানী টাটার ইস্পাত, সার ও বিদ্যুৎ খাতে ২৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগের মতো বড় প্রস্তাব অর্থনীতিতে কি ভূমিকা রাখবে তা অনুধাবন করা দরকার। একইসাথে দেশের সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের দিক দিয়ে এধরনের বড় বিনিয়োগের ছায়ামূল্য (shadow price) কতটুকু তাও বোঝা প্রয়োজন। এসব বিচারে বৈদেশিক বিনিয়োগের স্বল্প, মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাবের একটা নির্মোহ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বৈদেশিক বিনিয়োগ বিষয়ে সিপিডি'র গবেষণা কার্যক্রম

সিপিডি তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের গুরুত্ব বিবেচনা করে ধারাবাহিকভাবে এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে আসছে। সিপিডি'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক প্রকাশনা "Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD)" তে এ বিষয়ের ওপর পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প, সেমিনার এবং পত্র পত্রিকায় সিপিডি এ বিষয়ের ওপর তার দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরে। বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সিপিডি'র বিভিন্ন প্রকাশনার একটি তালিকা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হলো। এসব প্রকাশনায় সিপিডি দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছে। সিপিডি বৈদেশিক বিনিয়োগের বিপক্ষে নয়, তবে দেশের কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণে তা কতটুকু সহায়ক তা বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে সিপিডি মনে করে। সিপিডি'র মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগের কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিত করতে হলে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাব কোন্ খাতে, কি শর্ত বা সুবিধাদি প্রদানের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে বাস্তবানুগ সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে যোগ্য সহায়তা দিয়েছেন সিপিডি'র গবেষকবৃন্দ - কাজী মাহমুদুর রহমান, শারমীন ফারহানা রহমান এবং শরীফ রাসেল। সিপিডি'র গবেষণা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান এ গবেষণা কর্মে তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়েছেন এবং তা যথাসময়ে প্রকাশে সহায়তা করেছেন। ডায়লগ ও প্রকাশনা বিভাগের প্রধান আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ গবেষণা কর্মটি প্রকাশের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। গবেষণা কর্মটি নির্ভুলভাবে টাইপ করে দিয়েছেন লুৎফর রহমান পাটোয়ারী এবং হামিদুল হক মন্ডল। এছাড়া নির্ভুল পরিমার্জনার কাজটি করেছেন মেফতাউর রহমান। তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ: গতি-প্রকৃতি ও প্রভাব

১. ভূমিকা

বৈদেশিক বিনিয়োগের গতি-প্রকৃতির আলোকে স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন বিচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি ভালো "টেস্ট কেস" হতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মোটামুটি ভালো[১] করলেও বৈদেশিক বিনিয়োগ খুব একটা আকৃষ্ট করতে পারেনি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু বৈদেশিক বিনিয়োগ আসলেও আশি এবং নব্বইয়ের দশকে এর প্রবাহ ছিল খুবই কম। সামগ্রিক বিচারে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে কতটুকু ত্বরান্বিত হতে পারে তা বিশ্লেষণ করা দরকার। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বৈদেশিক বিনিয়োগের কার্যকারিতা এবং এর সীমাবদ্ধতার বিষয়ে আলোকপাত করা বর্তমান গবেষণা কর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র গ্রহণের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য বিমোচনে বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাব্য ভূমিকা খুঁজে দেখাও জরুরি।

দেশে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে আমদানি-বিকল্প শিল্পনীতির আওতায় স্থানীয় বাজার ভিত্তিক খুব অল্প পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগের মজুদ ছিল। বৈদেশিক বিনিয়োগের একটি বড় অংশই ছিল বহুজাতিক কোম্পানির বিনিয়োগকৃত এবং এর সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করত দেশের চা শিল্প । এছাড়াও স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে একাধিক বিদেশী ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানি এদেশে কাজ করত। সেসময় থেকেই বাংলাদেশ তার ক্রমবর্ধমান সঞ্চয়-বিনিয়োগের ঘাটতি এবং আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্যের সমস্যা মেটাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে বিগত দু'দশক ধরে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতিমালা বিনিয়ন্ত্রণ ও উদারীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং দেশের মূলধন বাজারে বিদেশী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ উন্মুক্ত করা হয়েছে।

বিনিয়োগ নীতিমালায় ব্যাপক পরিবর্তন ও উদারীকরণ সত্ত্বেও দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক বিনিয়োগ আসেনি, জনপ্রতি হিসেবে এর পরিমাণ ৩.৬ ডলারের মতো। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে সরকার প্রদত্ত নিমন্ত্রণমূলক নীতি খুব একটা কার্যকরী হয়নি। বরং দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যে সব পূর্বশর্ত রয়েছে সেগুলো পূরণ করা জরুরি, এসব পূর্বশর্তের মধ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়টি অগ্রগণ্য। উপরন্তু ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে মানবসম্পদের পর্যাপ্ততা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ প্রাপ্তির মতো বিষয়গুলো বর্ধিত বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য প্রাথমিক শর্তরূপে বিবেচিত হয়। এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের পরিচালনা ব্যয় বিশেষ করে বাজার মধ্যস্থতা (market intermediation) ব্যয় এবং চুক্তি প্রয়োগ সক্ষমতা (contract enforcement) ব্যয়ের মতো বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে তাদের অগ্রাধিকারমূলক খাতগুলোতে অধিকতর বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নের সুযোগ ক্রমান্বয়ে সীমিত হয়ে পড়ছে। অতি সম্প্রতি একাধিক নতুন বিষয়, যেমন: আইএমএফের প্রণোদনায় "মূলধন হিসাবের রূপান্তরযোগ্যতা", বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় আলোচিত সিঙ্গাপুর ইস্যুর অন্তর্ভুক্ত "বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতি" এবং কর্পোরেট সামাজিক

[১] উদাহরণ হিসেবে, ধারাবাহিকভাবে ৫ শতাংশের উপর জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে সামষ্টিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকা, ৫-৭ শতাংশের মধ্যে মূল্যস্ফীতি বজায় রাখা এবং জাতীয় আয়ের ৪.৫ শতাংশের নিচে বাজেট ঘাটতি থাকার কথা বলা যায়। বিগত ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশ রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি দশ শতাংশের উপরে বজায় রেখেছে — এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৭৬০ কোটি ডলার রপ্তানি সম্ভব হয়েছে। এসময় কালে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে বছরপ্রতি প্রায় ৪০০ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। মানব উন্নয়ন সূচকগুলোর ক্রমশ উন্নতি হয়েছে, বিশেষত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

দায়িত্বশীলতা (Corporate Social Responsibility) ইত্যাদি বিষয় বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতিমালা সংক্রান্ত বিতর্কে যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই ইস্যুগুলোর প্রাসঙ্গিক অংশগুলো ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।

আলোচ্য গবেষণাপত্রে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি, যেমনঃ বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা, বিনিয়োগ প্রবাহের অতীত ও সাম্প্রতিক ধারা, বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাব বিশেষত দারিদ্র্য দূরীকরণে এর সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সবশেষে উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকার একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের নীতি কাঠামো

ক. বৈদেশিক বিনিয়োগের আইনগত কাঠামো

একটি বাজার-বান্ধব, বেসরকারি খাত ভিত্তিক উন্নয়ন নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৈদেশিক বিনিয়োগের নীতি কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আশির দশকের শুরু হতে বেসরকারি খাতের অধিকতর সম্প্রসারণ, বিশেষত বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য একাধিক নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। ২০০৫ সালে প্রণীত শিল্পনীতির আওতায় বেসরকারি খাতকে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এ নীতির আওতায় কিছু সংরক্ষিত খাতকে বেসরকারি বিনিয়োগের আওতার বাইরে রেখে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অবাধ বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া হয়েছে।[২] উল্লেখ্য যে, বেসরকারি বিনিয়োগ বলতে দেশী ও বিদেশী একক বা যৌথ বিনিয়োগকে বোঝানো হয়ে থাকে।[৩] এছাড়া বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ বিদেশী বিনিয়োগকারীকে সর্বাপেক্ষা সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ (MFN) বা জাতীয় মর্যাদা (National Treatment) দেবার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতি কাঠামো দুটি সুনির্দিষ্ট আইনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে। একটি হলো, বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ও সুরক্ষা (Foreign Investment Promotion and Protection Act) আইন, ১৯৮০ এবং অপরটি হলো বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Export Processing Zone Authority Act) আইন, ১৯৮১। প্রথমটিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের আওতা ও ক্ষেত্র এবং দ্বিতীয়টিতে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য প্রদত্ত ব্যবস্থাদি বর্ণিত হয়েছে।

খ. বৈদেশিক বিনিয়োগের সুরক্ষা ব্যবস্থা

বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ও সুরক্ষা আইন, ১৯৮০ এর আওতায় সরকারের পক্ষ হতে কোনো বিদেশী বিনিয়োগ অধিগ্রহণ (expropriation) করা হলে সুনিশ্চিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া কোনো বিদেশী বিনিয়োগকারী অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ এবং তা বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে বিনিয়োগকৃত সম্পদের বাজারমূল্য বিবেচনা করা হয়। তবে ১৯৮০ সালে এ আইন প্রণয়নের পর হতে এ পর্যন্ত কোনো বিদেশী সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়নি। বস্তুত দেশে বাজার অর্থনীতির ব্যাপক প্রসারের কারণে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ঝুঁকির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ "বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ জামিনদার এজেন্সী" (Multilateral Investment Gurantee Agency) এর স্বাক্ষরকারী দেশ হবার কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগকে বহুলাংশে রাজনৈতিক ঝুঁকির আওতার বাইরে রাখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্যুরেন্স এবং আর্থিক কার্যক্রমগুলো বিশেষত "বৈদেশিক বেসরকারি

[২] সংরক্ষিত খাতগুলো হলো অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, পারমাণবিক শক্তি, সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল, বনায়ন ও সংরক্ষিত বনভূমির সীমানায় যান্ত্রিক আহরণ।

[৩] যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশী বেসরকারি কোম্পানির সাথে দেশীয় সরকারী কোম্পানির অংশীদারিত্ব থাকতে পারে।

বিনিয়োগ করপোরেশন" (Overseas Private Investment Corporation) এর কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো বাধা নেই। এছাড়া বাংলাদেশ "বিশ্ব মেধাস্বত্ব কর্তৃপক্ষ" (World Intellectual Property Organization) এবং "বিশ্ব বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এজেন্সীগুলোর সংস্থারও" (World Association of Investment Promotion Agencies) সদস্য। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায়, দেশে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সম্পত্তি এবং অন্যান্য অধিকার আন্তর্জাতিক মানে সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়া "রপ্তানি ঋণ জামিন স্কীম" (Export Credit Guarantee Scheme) এর আওতায় রপ্তানিকারকদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাজনিত ঝুঁকির ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। রপ্তানি আয় প্রদানজনিত ঝুঁকি এবং প্রাক-জাহাজীকরণের আর্থিক জামিনও এ স্কীমের অন্তর্ভুক্ত।

গ. বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত প্রয়োজনীয় ইকুইটি এবং নিজ দেশে অর্থ প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা

বেসরকারি খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো উর্ধ্বসীমা বা নিম্নসীমা নেই। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে তাদের শেয়ারে অর্জিত ডিভিডেন্ড ও মুনাফা এবং শেয়ার বিক্রয় থেকে অর্জিত আয় নিজ দেশে প্রত্যাবাসন করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, এখন পর্যন্ত বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আয় দেশে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাধাদানের কোনো নজির পাওয়া যায়নি।

ঘ. স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারের আবশ্যকতা

সাধারণভাবে বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। শিল্প কারখানাগুলো প্রয়োজনীয় কাঁচামাল স্থানীয় বাজার থেকে অথবা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে আর্ন্তজাতিক বাজার থেকে সংগ্রহ করতে পারে। অবশ্য ঔষধ শিল্পের কতিপয় ঔষধের ক্ষেত্রে কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া গার্মেন্টস এবং কিছু অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করাকে উৎসাহিত করতে সরকার নগদ সহায়তা এবং ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধা দিয়ে থাকে।

বক্স ১: বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের নীতি কাঠামো

প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ	বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ
বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ও নিশ্চয়তা	জাতীয়করণ ও অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চুক্তি ও ধারা মোতাবেক আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা - বৈদেশিক বিনিয়োগ (উৎসাহিতকরণ ও সুরক্ষা) আইন, ১৯৮০ - নিম্নোক্ত চুক্তির সদস্য হিসেবে প্রদত্ত সুবিধাদি বহুপক্ষীয় বিনিয়োগ জামিনদার এজেন্সী (MIGA) বিনিয়োগ বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকরণে গঠিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন (ICSID) মেধাস্বত্ব আইন
ইকুইটি অংশগ্রহণ	১০০ ভাগ পর্যন্ত ইকুইটি মালিকানার সুবিধা
মূলধন বিদেশে প্রত্যাবসনের ব্যবস্থা	মূলধন ও অর্জিত লাভ/ডিভিডেন্ড প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা
আর্থিক সুবিধাদি	- শিল্প কারখানার জন্য অবস্থান ভেদে ৩ থেকে ৭ বছরের কর অবকাশ সুবিধা - মূলধন যন্ত্রপাতি এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত আমদানি শুল্ক সুবিধা - রয়্যালটি, বৈদেশিক ঋণের সুদ এবং শেয়ার হস্তান্তরের ফলে অর্জিত মূলধন আয়ের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার - শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ শুল্ক মুক্ত আমদানি সুবিধা
ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি	- রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থাদি - শিল্প এলাকায় অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে জমি এবং বিদ্যুৎ , গ্যাস, পানি ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা

সূত্র: ভট্টাচার্য (২০০২)

ঙ. প্রযুক্তি হস্তান্তরের আবশ্যকতা

সাধারণভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তরের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য কিছু কিছু খাতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যেমন: আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে এসব কোম্পানি চুক্তির মেয়াদ শেষে তাদের ব্যবহৃত প্রযুক্তি জাতীয় তেল কোম্পানির (পেট্রোবাংলা) কাছে হস্তান্তর করার কথা। এর আওতায় বিদেশী কোম্পানিগুলো স্থানীয় মানব সম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে এবং কিছু ভারী যন্ত্রপাতি হস্তান্তর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

চ. পরিবেশ সংক্রান্ত মান

বিদেশী বিনিয়োগকারীদের পরিবেশ সংক্রান্ত কতিপয় নিরাপত্তা মান নিশ্চিত করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে যথাযথ পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন, বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল স্থাপন, নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি। পরিবেশ অধিদপ্তর এ সংক্রান্ত ছাড়পত্র দিয়ে থাকে।

ছ. বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

ব্যবসায়িক লেনদেন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ মানসম্পন্ন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া মেনে চলে। বিনিয়োগকারীরা সরকার বা অন্য বেসরকারি পক্ষের সাথে উদ্ভূত বিরোধের ক্ষেত্রে আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে। যদি তারা অধিকার লংঙ্ঘন হবার আশঙ্কা করে, তবে হাইকোর্টেরও শরণাপন্ন হতে পারে।

শ্রম সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা শ্রম আদালতে আপিল করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৭টি শ্রম আইন বলবৎ রয়েছে, এর মধ্যে মজুরি ও চাকুরী, ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প-বিরোধ, কাজের পরিবেশ, শ্রম ব্যবস্থাপনা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত। শিল্প সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে শিল্প সম্পর্ক আইন, ১৯৬৯ এর আওতায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সম্মিলিত দরকষাকষি দলের একজন প্রতিনিধির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ শ্রম অধিকার সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থার (International Labour Organization) প্রধান প্রধান কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে এবং সেগুলোকে আইন হিসেবে কার্যকর করেছে। বর্তমানে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকারের বিষয়টি ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।[৪]

বাংলাদেশ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের রাষ্ট্র ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সংঘটিত "বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি" কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া আন্ত র্জাতিক বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি কেন্দ্রের (International Centre for the Settlement of Investment Dispute) আওতায় বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

জ. কর অবকাশ এবং কর অব্যাহতিকরণ নীতিমালা

বাংলাদশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিল্প কারখানার অবস্থান ভেদে ৫ থেকে ৭ বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা দেয়া হয়। এ সুবিধা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে (পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদে) অবস্থিত শিল্প কারখানার জন্য ৫ বছর; খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জেলায় অবস্থিত শিল্প কারখানার জন্য ৭ বছর পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ কর অবকাশ সুবিধা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে।

[৪] শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার-এর আওতায় সংগঠনের সবার সম্মিলিত দরকষাকষি করার অধিকার (কনভেনশন ৮৭ এবং ৯৮), জোরপূর্বক ও বাধ্যতামূলক শ্রম পরিহার (কনভেনশন ২৯ এবং ১০৫), চাকুরী ও জীবিকার বৈষম্য দূর (কনভেনশন ১০০ এবং ১১১), এবং শিশুশ্রমের ব্যবহার বন্ধ করার (কনভেনশন ১৩৮ এবং ১৮২) বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ সর্ব নিম্ন মজুরির (কনভেনশন ১৩৮) বিধান ব্যতিরেকে অন্যান্য কনভেনশনগুলোকে আইনগত বৈধতা দিয়েছে।

এছাড়া কর অব্যাহতিকরণ নীতিমালার আওতায় বিদেশী কোনো ফার্ম, কোম্পানি বা বিশেষজ্ঞের উপার্জিত রয়্যালটি, কারিগরি ব্যবহারিক জ্ঞান (know how) থেকে উপার্জিত ফি, ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্সে বর্ণিত সিডিউল মোতাবেক শিল্প কারখানায় কর্মরত বিদেশী কারিগরদের আয়ের ওপর প্রযোজ্য কর, বেসরকারি খাতে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানির উৎপাদনের তারিখ হতে ১৫ বছর পর্যন্ত অর্জিত আয়ের ওপর প্রযোজ্য কর, স্টক এক্সচেঞ্জে অধিভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার আদান প্রদানের ফলে উপার্জিত মূলধন আয়ের (capital gain) ওপর প্রযোজ্য কর ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি দেয়া হয়ে থাকে।

যে সকল শিল্প কারখানা ওপরে বর্ণিত অবকাশ সুবিধা ভোগ করছে না, তাদের জন্য দ্রুততর অবচিতি ভাতা (accelerated depreciation allowance) এর ব্যবস্থা রাখা রয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা শহর এবং এসব শহরের মিউনিসিপ্যালিটির ১০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত কারখানার ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বা কারখানা স্থাপনের খরচের শতভাগ পর্যন্ত এ ভাতা দেয়া হয়। উপরোক্ত এলাকার বাইরে অবস্থিত শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৮০ ভাগ এবং দ্বিতীয় বছরে ২০ ভাগ দ্রুততর অবচিতি ভাতা দেয়া হয়ে থাকে।

ঝ. মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত শুল্ক সুবিধা

প্রাথমিকভাবে স্থাপিত শিল্প কারখানার জন্য অথবা বর্তমানে কার্যরত শিল্প কারখানার BMR/BMRE এর জন্য মূলধন যন্ত্রপাতি এবং খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্কের (ad valorem) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অবশ্য এ সুবিধা পেতে হলে খুচরা যন্ত্রপাতির মূল্য মোট মূলধন যন্ত্রপাতির C&F মূল্যের ১০ ভাগের কম হতে হবে। এছাড়া শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানার মূলধন যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানি শুল্ক প্রদান ব্যতিরেকে দেশে আমদানি করা যায়। অবশ্য ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা indemnity বন্ডের বিপরীতে রেখে দেয়া হয়, যা যন্ত্রপাতি স্থাপনের পর ফেরত দেয়া হয়। এছাড়া আমদানিকৃত মূলধন যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য নয়।

ঞ. প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগ বৈদেশিক বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সে অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদেয় সব ধরনের সুযোগ সুবিধা তারা পেয়ে থাকে। এছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা অন্যান্য বিদেশী বিনিয়োগকারীরা পান না। প্রবাসীরা মূলধন বাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের জন্য সংরক্ষিত কোটার আওতায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ারের (আইপিও) ১০ শতাংশ কিনতে পারে। এছাড়া প্রবাসীরা অন্যান্য বিদেশী বিনিয়োগকারীর মতো "প্রবাসী বৈদেশিক মুদ্রা আমানত তহবিলে" (non-resident foreign currency deposit account) বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে পারেন।

ট. ভাসমান মুদ্রা ব্যবস্থা

বিগত মে ২০০৩ হতে বাংলাদেশ ভাসমান মুদ্রা ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে। এর ফলে দেশে অবস্থানরত ব্যক্তি/ফার্ম তাদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত লেনদেনসহ অন্যান্য লেনদেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়াই যেকোন অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে করতে পারে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ইকুইটি এবং পোর্টফোলিও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পূর্বানুমতির প্রয়োজন নেই। এছাড়া নিম্নোক্ত ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতির প্রয়োজন নেই, যেমন: বিদেশী ফার্ম ও কোম্পানি কর্তৃক তাদের অর্জিত লাভ বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য শিল্পকারখানা স্থাপনে শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের ডিভিডেন্ড ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে, বিদেশী ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের পোর্টফোলিও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, বিনিয়োগ বোর্ড-এর গাইডলাইন মোতাবেক কারিগরি সহায়তা/রয়্যালিটি

চুক্তির বিপরীতে কারিগরি ফি এবং রয়্যালিটি ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে। এছাড়া চলতি হিসাবে ভাসমান লেনদেন ব্যবস্থা চালুর পাশাপাশি মূলধন হিসাবে ভাসমান লেনদেন ব্যবস্থা প্রয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।

ঠ. দেশের মূলধন বাজারে প্রাথমিক শেয়ার ছাড়া

বিদেশী বিনিয়োগকারী কর্তৃক দেশের শেয়ার বাজারে কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার ছাড়ার বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ কারণে অধিকাংশ বিদেশী কোম্পানি তাদের কোম্পানির কোনো শেয়ার দেশের মূলধন বাজারে ছাড়ছে না। অথচ মূলধন বাজারের গতিশীলতা এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে দেশীয় কোম্পানির পাশাপাশি বিদেশী কোম্পানির বাজার হতে আরও বেশি পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা দরকার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফ্রান্সের লাফার্জ সুরমা কোম্পানি তাদের মোট অনুমোদিত মূলধনের ৪ শতাংশ দেশের মূলধন বাজার হতে সংগ্রহ করেছে। অতি সম্প্রতি দেশের পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা (সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন) দেশে কর্মরত বৃহদাকারের দেশী/বিদেশী কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার মূলধন বাজারে ছাড়ার নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে, যা সার্বিকভাবে মূলধন বাজারকে গতিশীল করতে সাহায্য করবে বলে প্রতীয়মান হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে কোম্পানি পর্যায়ে বিদ্যমান কর্পোরেট সুশাসন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধান করা দরকার।

ড. অন্যান্য সুবিধাদি

এছাড়া বিদেশীদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেমন, সর্বনিম্ন ৫ লক্ষ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ বা কোনো স্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার (অফেরতযোগ্য) জমা রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের সুযোগ; সর্বনিম্ন ৭৫ হাজার মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থায়ী বসবাসের অধিকার লাভ; অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতের (Thurst Sector) অন্তর্ভুক্ত রপ্তানিমুখী শিল্পে বিনিয়োগের জন্য বিশেষ সুবিধা এবং ঝুঁকি মূলধন (Venture Capital) গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।[৫]

ঢ. দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং শুল্কায়ন চুক্তি

বাংলাদেশ বেশ কিছু দেশের সাথে বিনিয়োগ ও শুল্কায়ন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং সুরক্ষা চুক্তি, ১৯৮০ এর আওতায় এ পর্যন্ত মোট ২০টি দেশের সাথে বাংলাদেশের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মধ্যে উন্নত দেশগুলো (ওইসিডিভুক্ত), পূর্ব ইউরোপীয় এবং কিছু এশীয় দেশ (চীন, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ইরান এবং তুরস্ক) রয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু দেশের সাথে বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে এ মুহূর্তে আলোচনা চলছে। এসব দেশের সাথে দ্বৈত কর প্রত্যাহারজনিত চুক্তি (Double Taxation Treaty) ও স্বাক্ষরিত হয়েছে। অবশ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এসব দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ চুক্তি বা দ্বৈতকর প্রত্যাহারজনিত চুক্তির সাথে বাস্তবে দেশে আগত বৈদেশিক বিনিয়োগের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই।

ণ. দ্বিপক্ষীয় এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহ

বাংলাদেশ একাধিক দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (সাফটা) এবং বঙ্গোপসাগরীয় দেশসমূহের বহু খাতভিত্তিক কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উদ্যোগ (বিমসটেক)। এছাড়া দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির আওতায় প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে,

[৫] শিল্পনীতি ২০০৫ এ বর্ণিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলো হলো - কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পাট ও পাট মিশ্রিত পণ্য, তৈরি পোশাক, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও আইসিটি পণ্য, অটোমোবাইলসহ হালকা যন্ত্রপাতি, ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য, সিরামিক, উচ্চমূল্য সংযোজিত তৈরি পোশাক শিল্প, নিবিড় চিংড়ি চাষ, ফুল চাষ, অবকাঠামো, পর্যটন, বেসিক কেমিক্যালস, বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত রং ও রাসায়নিক দ্রব্য, চশমার ফ্রেম, ফার্নিচার, লাগেজ, কসমেটিক ও টয়লেট্রিজ, সিআরকয়েল, হস্তশিল্প পণ্য, স্টেশনারী দ্রব্য, ভেষজ ঔষধ শিল্প, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বনায়ন, হর্টিকালচার, কৃত্রিম ফুল উৎপাদন, ইলেকট্রনিক্স, হিমায়িত খাদ্য, জুয়েলারী ও ডায়মন্ড কাটিং ও পলিশিং, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং শুটিপোকার চাষ ও রেশম শিল্প।

বিশেষত ভারতের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে। এবছরই পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ কাঠামো চুক্তির (Trade and Investment Framework Agreement) আলোচনা অদূর ভবিষ্যতে শেষ হতে পারে। এসব চুক্তির আওতায় সৃষ্ট বাজার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা প্রয়োজনীয় রুলস অব অরিজিন (rules of origin) মিটিয়ে সহযোগী দেশে রপ্তানি করার সুযোগ নিতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা বলা যায় যে, বিদেশী বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ বিচারে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বিনিয়োগ নীতি কাঠামো মেনে চলছে।

পরবর্তী অংশে প্রদত্ত উদাহরণ থেকে দেখা যাবে, বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের প্রতিশ্রুত উদারনীতি আন্ত রিকভাবে গ্রহণ করে একটি সক্ষম ও গ্রহণযোগ্য সরকারের পক্ষে খুব কমই বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৫ এর প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, (পৃষ্ঠা ১.৫) বিনিয়োগ পরিবেশ মূলত তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এগুলো হলো প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধকতা, বিনিয়োগ ঝুঁকি এবং বিনিয়োগ ব্যয়। এদিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশ তার উন্নয়নের বর্তমান পর্যায় থেকে এ তিনটি বিষয়ের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দেবার পরও বৈদেশিক বিনিয়োগ খুব একটা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি।

অন্যদিকে বিনিয়োগ আসা/যাওয়া বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন প্রায় সব বাধাই বাংলাদেশ দূর করেছে। বৈদেশিক বিনিয়োগের বাধা দূর করতে প্রায় সব আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে (বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৫, অধ্যায় ৯, পৃষ্ঠা ৯.১)। বাংলাদেশে বিনিয়োগ ঝুঁকি সম্পর্কে বলা যায়, দেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সুনিশ্চিত বিনিয়োগ নীতির আলোকে বিনিয়োগের সম্পূর্ণ সুরক্ষা বজায় থাকায় বিনিয়োগ ঝুঁকি খুব কম। "বিনিয়োগ ব্যয়" সম্পর্কে বলা যায়, দেশে উদার শুল্ক অব্যাহতি নীতি, প্রতিযোগিতামূলক প্রান্তিক শুল্ক হার, অন্যান্য দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম শুল্ক স্তর, এবং শ্রমবাজারে খুব কম হস্তক্ষেপের কারণে বিনিয়োগ ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম।

এটা সত্যি যে, এদেশে প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে অতিরিক্ত উপার্জনের (rent seeking) মানসিকতা থাকার দরুন লেনদেন ব্যয় (transaction cost) প্রায়ই বেশি হয়ে থাকে। একদিকে দেশে ভৌত অবকাঠামোর দুর্বলতার জন্য বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিনিয়োগ পরিবেশে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। অবশ্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো "কাঠামোগত সংস্কারের দশক" জুড়ে সব সময় বলে এসেছে যে, বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান হাতিয়ার হলো বিনিয়ন্ত্রণ, বেসরকারিকরণ এবং উদারীকরণ। এতদসত্ত্বেও অনুন্নত দেশগুলোতে উদারীকরণের পরও পর্যাপ্ত বৈদেশিক বিনিয়োগ না আসায় বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠান তাদের পূর্বের বক্তব্য থেকে সরে এসে এদেশগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (institutionalization) এবং সাম্প্রতিককালে সুশাসন (governance) প্রতিষ্ঠার ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

৩. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী

ক. বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যের অসামঞ্জস্যতা

২০০২ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের কোনো গ্রহণযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। পূর্বে বিনিয়োগ বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগের গণনা পদ্ধতি নিয়ে বিরোধ ছিল। এর একদিকে ছিল বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক বৈদেশিক বিনিয়োগ বেশি করে দেখানোর প্রবণতা অন্যদিকে ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক লেনদেন হিসাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ হিসেবে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, পুন:বিনিয়োগ, ও আন্ত:কোম্পানি ঋণ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি সঠিকভাবে উপস্থাপিত না হবার জন্য কম

বৈদেশিক বিনিয়োগের চিত্র। এছাড়া রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় বিনিয়োগকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগের তথ্যও বৈদেশিক লেনদেন অন্তর্ভুক্ত করা হতো না।

বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যগত এ বিভ্রান্তি তুলে ধরে তার সমাধানের লক্ষ্যে সিপিডি ২০০২ সালে সর্বপ্রথম দেশে নিয়োজিত বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ওপর জরিপ চালানোর প্রস্তাব করে। এর ভিত্তিতে আইএমএফ নির্দেশিত পদ্ধতিতে ২০০২ সাল হতে বাংলাদেশ ব্যাংক[৬] ও বিনিয়োগ বোর্ড পৃথকভাবে জরিপ পরিচালনা এবং তার তথ্য প্রকাশ শুরু করে। বিনিয়োগ বোর্ডের জরিপের তথ্য মতে, ২০০২ সালে বাংলাদেশে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৩২.৮২ কোটি মার্কিন ডলার আর বাংলাদেশ ব্যাংকের জরিপের তথ্য মতে তা ছিল ৩২.৮৩ কোটি মার্কিন ডলার অর্থাৎ উভয় জরিপের তথ্যে খুব অল্প পার্থক্য চোখে পড়ে (০.০১ কোটি মার্কিন ডলার)। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য সারণি ১ দ্রষ্টব্য। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে (২০০৩ এবং ২০০৪), উভয় জরিপের তথ্যে অসামঞ্জস্যতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে দেখা গেছে (যেমন ২০০৩ ও ২০০৪ সালে এ পার্থক্য ছিল যথাক্রমে ৯.১২ এবং ২০.০৪ কোটি মার্কিন ডলার)।

সারণি ১: বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন: তথ্যগত অসামঞ্জস্যতা

(কোটি মার্কিন ডলারে)

	বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ			
	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫
বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ				
বিনিয়োগ বোর্ড, ২০০৫	৩২.৮২	৪৪.১৪	৬৬.০৮	
বাংলাদেশ ব্যাংক জরিপের তথ্য	৩২.৮৩	৩৫.০২	৪৬.০৪	৬৫.৩৭*
বিনিয়োগ বোর্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর হিসাবের পার্থক্য	*০.০১*	*৯.১২*	*২০.০৪*	
বাংলাদেশ ব্যাংক এর বৈদেশিক লেনদেনের তথ্য	৪.৯১**	২৬.৫৪	৩৯.১৭	৪৩.৫০*
বিশ্ব বিনিয়োগ রিপোর্ট, ২০০৫	৫.২০**	২৬.৮০	৪৬.০০	
বৈদেশিক বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা (বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত)	৩০.০	৪০.০	৬০.০	৮০.০
লক্ষ্যমাত্রা ও প্রবাহের মধ্যে পার্থক্য				
বিনিয়োগ বোর্ড, ২০০৫	+২.৮২	+৪.১৪	+৬.০৮	
বাংলাদেশ ব্যাংক জরিপের তথ্য	+২.৮৩	-৪.৯৮	-১৩.৯৬	-১৪.৬৩*
বাংলাদেশ ব্যাংক লেনদেন ভারসাম্য তথ্য	-২৫.০৯**	-১৩.৪৬	-২০.৮৩	-৩৫.৩০*
বিশ্ব বিনিয়োগ রিপোর্ট, ২০০৫	-২৪.৮০	-১৩.২০	-১৪.০০	

নোট: *অক্টোবর, ২০০৫ (১০ মাসের তথ্য); **প্রচলিত পদ্ধতিতে করা বৈদেশিক বিনিয়োগ হিসাব।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুসৃত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি বিনিয়োগ বোর্ডের অনুসৃত পদ্ধতি অপেক্ষা বেশি গ্রহণযোগ্য। বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক অনুসৃত প্রশ্নপত্রে বিদেশী কোম্পানির মোট আগত বিনিয়োগ সম্পর্কেই শুধু তথ্য নেয়া হয়, অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক উপরোক্ত তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন, দাবি ও দায়সমূহ, পরিচালনা মুনাফা ও নীট আয়, মোট বিনিয়োগ মজুদ ইত্যাদি তথ্য পরীক্ষা করে। আবার জরিপ কাজে ভিন্ন ভিন্ন একক (বাংলাদেশ ব্যাংক একক হিসেবে "হাজার টাকা" এবং বিনিয়োগ বোর্ড একক হিসেবে "মিলিয়ন ডলার") ব্যবহারের ফলেও প্রকৃত বিনিয়োগের তথ্যে গরমিল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকন্তু ভিন্ন ভিন্ন রেফারেন্স সময়কাল (বাংলাদেশ ব্যাংক রেফারেন্সকাল হিসেবে জুলাই-জুন এবং বিনিয়োগ বোর্ড রেফারেন্সকাল হিসেবে জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ব্যবহারও তথ্য বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। বৈদেশিক বিনিয়োগের জরিপ ও তথ্য সংগ্রহের কাজ উপরোক্ত কোন্ প্রতিষ্ঠানের অধীনে হবে, এটা পরিষ্কার নয়। কারণ বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ বোর্ডকে আইনগতভাবে বিনিয়োগের তথ্য দিতে বাধ্য নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২

[৬] বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোপূর্বে নব্বই দশকের শেষ দিকে বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি অনুধাবনের লক্ষ্যে নিজস্ব পদ্ধতিতে জরিপ পরিচালনা করে আসছিল। কিন্তু পদ্ধতিগত দুর্বলতার কারণে সেসব উপাত্ত কখনও ব্যবহার করা হয়নি।

এর আর্টিকেল ৬৯ এর অধীনে শুধু তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করতে পারে। বস্তুত দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জরিপের ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি সম্পর্কে আগের চেয়ে ভালো জানা গেলেও তথ্য বিভ্রান্তি নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে জরিপ পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে বিনিয়োগ বোর্ডের লজিস্টিক সহায়তা নিয়ে একটি মাত্র জরিপ পরিচালিত হওয়া দরকার বলে সিপিডি মনে করে (সিপিডি, ২০০৫)।[৭]

খ. বিনিয়োগ বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রা

বিদেশী বিনিয়োগকে আরো বেশি করে আকর্ষণের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড ২০০৩ সালে চার বছর মেয়াদি বৈদেশিক বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে।[৮] এর আওতায় ২০০৩ সালে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছিল ৪০ কোটি মার্কিন ডলার, ২০০৪ সালে ৬০ কোটি মার্কিন ডলার, ২০০৫ সালে ৮০ কোটি মার্কিন ডলার এবং ২০০৬ সালে ১০০ কোটি মার্কিন ডলার। লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বিনিয়োগ বোর্ড প্রচলিত প্রণোদনা পদ্ধতির বাইরে বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত বহুজাতিক কোম্পানির সাথে খাত-ভিত্তিক বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে। এর ফলশ্রুতিতে কিছু বহুজাতিক কোম্পানি এদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। যেমন, ভারতের টাটা গ্রুপ বিদ্যুৎ, সার ও ইস্পাত শিল্পে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ধাবী গ্রুপ টেলিযোগাযোগ ও হোটেল খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। কিন্তু সারণি ১ হতে দেখা যায়, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বিনিয়োগ বোর্ডের জরিপ মোতাবেক বিনিয়োগ প্রবাহ প্রতিবছরই বেশি এবং ক্রমান্বয়ে তা বেড়ে চলেছে। তাই বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পাশাপাশি বিনিয়োগ বোর্ডের জরিপে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি পরিমানে বিনিয়োগ দেখানোর প্রবণতা এ ধরনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বিভিন্ন উপাত্তের ভিত্তিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের কাঠামো, উৎস এবং প্রকার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। একইসাথে রপ্তানি এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং পোর্টফোলিও বিনিয়োগ প্রবাহে নব্বই দশকে যে অস্থিরতা বিরাজমান ছিল তা এ দশকের শুরুতে স্থিরতা এবং পরবর্তী সময়ে অগ্রগতি লাভ করে। নব্বই দশকে বিনিয়োগ প্রবাহে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল ১৯৯৬-৯৭ সালে, যখন মূলধন বাজারে ধস নামার কারণে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ হিসেবে আগত ৬.২ কোটি ডলারের বেশি তরল অর্থ (hot money) দেশ থেকে বাইরে চলে যায়। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে তারল্য সংকট সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে বড় আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগের সুবাদে দেশে '৯০ দশকে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ আসে (৩২.১ কোটি ডলার) ১৯৯৭-৯৮ সালে। তারপর থেকে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতিতে এক ধরনের নিস্তেজ অবস্থা বিরাজ করেছে । বিস্তারিত সারণি ২ এ সন্নিবেশিত আছে।

সারণি ২: বৈদেশিক বিনিয়োগের নীট প্রবাহ (কোটি ডলার)

অর্থবছর	প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ			পোর্টফোলিও বিনিয়োগ			ইপিজেডে নীট বৈদেশিক বিনিয়োগের অন্ত:প্রবাহ	সার্বিক নীট বৈদেশিক বিনিয়োগের অন্ত:প্রবাহ	নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ ও জাতীয় আয়ের অনুপাত	নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ অনুপাত	মাথাপিছু বৈদেশিক বিনিয়োগ (ডলারে)
	অন্ত: প্রবাহ	বহি: প্রবাহ	নীট প্রবাহ	অন্ত: প্রবাহ	বহি: প্রবাহ	নীট প্রবাহ					
১৯৯৭-৯৮	২৭.৩০	২.৪০	২৪.৯০	১.৪০	১.১০	০.৩০	৬.৮৮	৩২.০০	০.৭৩	৪.৭৭	২.৫৯
১৯৯৮-৯৯	২০.০০	০.২০	১৯.৮০	০.৩০	০.৯০	-০.৬০	৭.০৬	২৬.২৬	০.৫৭	৩.৭১	২.০৮
১৯৯৯-০০	১৯.৪৪	০.০৮	১৯.৩৬	১.০৭	১.০৬	০.০১	৩.৪৯	২২.৮৭	০.৪৯	৩.১১	১.৭৯
২০০০-০১	১৬.৬১	০.০১	১৬.৬০	০.৫৯	০.৬৩	-০.০৪	৪.৮৪	২১.৪০	০.৪৬	২.৮৮	১.৬৫

[৭]অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক লেনদেন হিসাবে জরিপের তথ্য সন্নিবেশিত করে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রকৃত হিসাব প্রকাশের কথা থাকলেও পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সর্বশেষ প্রকাশিত বৈদেশিক লেনদেন হিসাব ২০০২-০৩ এ তা সমন্বয় করা হয়নি।

[৮]লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের শাসনকালীন শেষ বছর (২০০৬) কে বিবেচনায় রাখা হয়।

২০০১-০২	৬.৫২	০.০৬	৬.৪৭	০.০৫	০.৬১	-০.৫৬	৫.৫৭	১১.৪৮	০.২৪	১.৪৪	০.৮৭
২০০২-০৩	৯.৪৯	০.৩০	৯.১৯	০.২০	০.০৪	০.১৬	১০.৩১	১৯.৬৬	০.৩৯	২.২৪	১.৪৭
২০০৩-০৪	১৪.৭৮	০.৬৬	১৪.১২	০.৫৪	০.০০	০.৫৪	১১.৫০	২৬.১১	০.৬৮	৩.৮২	২.৯৪
২০০৪-০৫	৩৬.৯৬	০.২৮	৩৬.৬৮	০.০১	০.০০	০.০১	১১.৮৫	৪৮.৫৪	০.৮১	৪.৩৪	৩.৬৩

সূত্রঃ সিপিডি ডাটাবেজ ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫।

২০০৩ সাল হতে বৈদেশিক বিনিয়োগে চাঙ্গা ভাব দেখা দিতে শুরু করে মূলত তেল ও যোগাযোগ খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগের কারণে। এ ধারা ২০০৪ এবং ২০০৫ সালেও অব্যাহত থাকে। বৈদেশিক লেনদেন হিসাব মোতাবেক অক্টোবর ২০০৫ পর্যন্ত মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৫.৩ কোটি মার্কিন ডলার। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের জরিপের তথ্য মোতাবেক এসময়কালে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৫.৪ কোটি ডলার, এর মধ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকাতে বিনিয়োগ হয়েছে ১০.৯ কোটি ডলার। বিনিয়োগের ধারা পর্যালোচনা করে বলা যায়, ভবিষ্যতে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের গতি প্রবাহ বহুলাংশে নির্ভর করবে ভারতের টাটার বিনিয়োগের উপর, যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।

বৈদেশিক বিনিয়োগের ৮০ শতাংশের বেশি অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকায় (domestic tariff area) এবং বাকি অংশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় বিনিয়োগ হচ্ছে। দেশে পোর্টফোলিও বিনিয়োগের অবস্থা একেবারেই করুন। নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে তা অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকায় বিনিয়োগ হওয়া থেকে বলা যায়, বিনিয়োগের গুণগত মান বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য দেশের সামগ্রিক বিনিয়োগ চাহিদার মাপকাঠিতে এ ধরনের বিনিয়োগ কোন্ খাতে হচ্ছে তা বিবেচনা করা দরকার।

অন্যদিকে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় বিনিয়োগ মূলত আর্থিক প্রণোদনাকে সামনে রেখেই হয়ে থাকে। এসব এলাকায় বিনিয়োগ আমদানি এবং পুন:রপ্তানি নির্ভর হবার কারণে খুব সামান্য পরিমাণেই দেশীয় মূল্য সংযোজনের সুযোগ থাকে। একই সাথে দেশে প্রতিষ্ঠিত আটটি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার[৯] মধ্যে শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রামের রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকাতেই ৯৯ শতাংশ বিনিয়োগ হয়েছে, যা এ ধরনের বিনিয়োগের কেন্দ্রীভবনকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে বেসরকারি খাতে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত কোরীয় রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা সরকারের সংরক্ষণমূলক নীতির কারণে এখনো চালু হতে পারেনি। সব মিলিয়ে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় বিনিয়োগ পরিস্থিতি উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

সব দিক মিলিয়ে বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে সুবিধা অর্জনের বিষয় বিবেচনা করলে, যেমন: কারিগরি উন্নয়ন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ও সেবার মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিবেচনায় অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকার বিনিয়োগই বেশি মূল্যবান বলে ধরা যায়। অবশ্য ইপিজেড বহির্ভূত অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকায় বিনিয়োগ বহুলাংশে বাধাগ্রস্ত হয় ভৌত অবকাঠামো, যেমন শিল্প প্লট, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ এবং টেলিফোন ইত্যাদির অপ্রতুল সরবরাহের কারণে। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকলেও ধাপে ধাপে তা উন্মুক্ত করার ফলে এসব এলাকায় বৈদেশিক বিনিয়োগে প্রভাব পড়তে পারে।[১০]

বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৫ এর অধ্যায় ৮ (পৃষ্ঠা ৮.১২) এ স্বীকার করা হয়েছে যে, একটি জটিল পরিবেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য ইপিজেড একটা পন্থা হতে পারে, কিন্তু এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

[৯] দেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত আটটি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা হলো: ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, মংলা, আদমজী, কর্ণফুলী এবং নাটোর। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাতকারে বেপজা চেয়ারম্যান বলেন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেড এর সমস্ত প্লট বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হলেও কুমিল্লায় ৬০ শতাংশ প্লট এবং মংলা, নাটোর ও ঈশ্বরদীতে প্রচুর প্লট খালি রয়েছে। অবশ্য কৌশলগত সুবিধা বিবেচনায় বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিনিয়োগেই বেশি আগ্রহী।

[১০] সাম্প্রতিককালে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় শ্রম অধিকারের বিষয়ে দেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানিকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র এবং সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগকারী দেশ কোরিয়া এবং জাপান ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের বিষয়টি বিনিয়োগ এবং রপ্তানি কোনোটাকেই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না করে, এমন অবস্থা থেকে বিচার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ধাপে ধাপে ট্রেড ইউনিয়ন চালু করার ব্যবস্থা থেকে বোঝা যায়, এ কাজটি বেশ জটিল।

ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফলের সুযোগ সীমিত। দেশের ইপিজেডে যে বিনিয়োগ হয়েছে, তা মূলত উন্নত দেশগুলোর বাজারে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা থাকার কারণে। একদিকে নতুন স্থাপিত ইপিজেডগুলোতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ আকর্ষণে সক্ষম না হওয়া, অন্যদিকে ইপিজেড বহির্ভূত এলাকায় পর্যাপ্ত সুবিধাদির অভাবে বিদেশীদের বিনিয়োগে অনীহার কথা মাথায় রেখে বর্তমানে সরকার "বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা" প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। আলোচ্য বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ইপিজেডে প্রচলিত আইন কাঠামো ও প্রণোদনা থেকে আলাদা আইনগত কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। এর আওতায় ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈরে হাই-টেক পার্ক স্থাপনের দীর্ঘদিনের আলোচিত প্রস্তাবটি দাতাদের অর্থ সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।[১১]

৫. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের কাঠামো ও উৎস

৫.১ কাঠামো

সারণি ৩ এ বৈদেশিক বিনিয়োগের কাঠামো বর্ণিত হয়েছে। প্রদত্ত তথ্য মোতাবেক ২০০৪ সালে বিনিয়োগকৃত মোট ৪৬.০৪ কোটি ডলারের মধ্যে ইকুইটি আকারে বিনিয়োগ হয়েছে ১৫.৬০ কোটি ডলার, যা মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রায় ৩৪ শতাংশ। এছাড়া পুনর্বিনিয়োগ হয়েছে ২৪.০ কোটি ডলার (৫২ শতাংশ), আন্ত:কোম্পানি ঋণ আকারে বিনিয়োগ হয়েছে ৫.২১ কোটি ডলার (১৪ শতাংশ)। সারণি ৩ থেকে আরও লক্ষণীয় যে, ২০০৫ সালের জুন পর্যন্ত দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে ৪৫.৩৭ কোটি ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২২৮ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে ইকুইটি মূলধনের বৃদ্ধির হার ছিল ৪২৫ শতাংশ, পুনর্বিনিয়োগকৃত মূলধন বৃদ্ধির হার ছিল ৬২ শতাংশ এবং আন্ত:কোম্পানি ঋণ বৃদ্ধির হার ছিল অস্বাভাবিকভাবে বেশী, ১৩৯০ শতাংশ। ২০০৫ সালে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মূল কারণগুলো হলো, কিছু টেলিকম কোম্পানির নতুন ও পুনর্বিনিয়োগ, এর মধ্যে সিংটেলের নতুন বিনিয়োগ, ওরাসকমের পুনর্বিনিয়োগ এবং ওয়ারিদ টেলিকমের রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ বিপুল অংকের বিনিয়োগ ইত্যাদি। বিনিয়োগের কাঠামো বিচার করলে দেশে অবস্থিত বিদেশী কোম্পানির পুনর্বিনিয়োগ সবচেয়ে বড় অংকের যোগান দিচ্ছে, বাইরে থেকে আগত নতুন বিনিয়োগের পরিমাণ বেশী নয়। এছাড়া স্বল্প সংখ্যক কোম্পানির নির্দিষ্ট কিছু খাতে বিনিয়োগের কারণে বিনিয়োগের মধ্যে খুব বৈচিত্র্য চোখে পড়ে না।

সারণি ৩: বৈদেশিক বিনিয়োগের কাঠামো

(কোটি মার্কিন ডলার)

বিবরণ	২০০২ (জানু-ডিসে)	২০০৩ (জানু-ডিসে)	২০০৪ (জানু-ডিসে)	২০০৫ (জানু-জুন)	প্রবৃদ্ধি হার (০৩-০৪)
ইকুইটি	১৩.৩৮	১৫.৬১	১৫.৫৯	২৪.৭৩	-০.১৩
পুনর্বিনিয়োগ	১১.৬৮	১৭.০১	২৩.৯৮	১৪.০৮	৪০.৯৮
আন্তঃকোম্পানি ঋণ	৭.৭৭	২.৪	৬.৪৭	৬.৫৬	১৬৯.৫৮
মোট	৩২.৮৩	৩৫.০২	৪৬.০৪	৪৫.৩৭	৩১.৪৭

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।

৫.২ বৈদেশিক বিনিয়োগের উৎস

চিত্র ১ এ ২০০৪ সালে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো। সে অনুসারে ২০০৪ সালে আগত মোট বিনিয়োগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (২৭ শতাংশ) এসেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো হতে, এর পর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হতে ১৯ শতাংশ, উত্তর আমেরিকা হতে ১৩ শতাংশ এবং জাপান থেকে এসেছে ৪ শতাংশ।

[১১] বিনিয়োগ বোর্ডের অধীনে বেসরকারি খাত উন্নয়ন প্রকল্পের (PSDP) আওতায় এ পার্ক উন্নয়নে ২০ কোটি ডলার ব্যয় হবে। বিশ্বব্যাংক, ডিএফআইডি, ইউরোপীয় কমিশন এবং ইউএসএআইডি এবং কানাডিয়ান সিডা এ প্রকল্পে অর্থ সহায়তা দিচ্ছে।

চিত্র ১: উৎস অনুসারে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ, ২০০৪

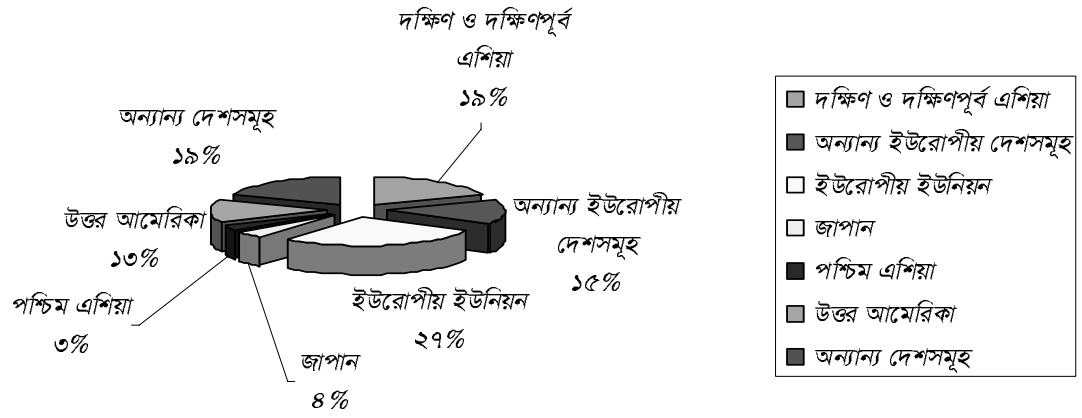

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৪ এ সর্বাধিক বিনিয়োগকারী দেশগুলোর বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো। ২০০৪ সালে বিনিয়োগকৃত ৪৬.০৪ কোটি ডলারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে যুক্তরাজ্য (৯.০৮ কোটি ডলার), এরপরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৬.২ কোটি ডলার), নরওয়ে (৫.৯৬ কোটি ডলার) এবং মালয়েশিয়ার (৩.৮৯ কোটি ডলার) অবস্থান। ধীরে ধীরে দেশের বৈদেশিক বিনিয়োগে স্বল্প সংখ্যক দেশের প্রাধান্য বাড়ছে, ২০০৪ সালে মাত্র ৫টি দেশ ৫০ শতাংশের বেশি বিনিয়োগ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের খাত ভিত্তিক বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ মূলত সেবাখাত ভিত্তিক যেমন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, তেল ও গ্যাস, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (LPG) বোতলজাতকরণ, স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের (যেমন নরওয়ে) বিনিয়োগ মূলত শিল্প ও সেবাখাত ভিত্তিক যেমন, টেক্সটাইল, সিমেন্ট, কৃষি, চামড়াজাত দ্রব্যাদি ও অন্যান্য। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে উপনিবেশগত সম্পর্কের কারণে এদেশে তাদের বিনিয়োগের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এ কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিনিয়োগের দুটো ধারা পরিলক্ষিত হয়, একটি হলো স্থানীয় বাজারকেন্দ্রিক এবং অন্যটি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিজনিত (সহজ এবং সস্তা শ্রম ভিত্তিক)।

সারণি ৪: বাংলাদেশে সর্বাধিক বিনিয়োগকারী দেশসমূহ

বিনিয়োগকারী দেশসমূহ	বিনিয়োগ					
	২০০২		২০০৩		২০০৪	
	কোটি মার্কিন ডলার	শতকরা হার	কোটি মার্কিন ডলার	শতকরা হার	কোটি মার্কিন ডলার	শতকরা হার
যুক্তরাজ্য	১.৮৫	৫.৬	৮.৩৬	২৩.৯	৯.০৮	১৯.৭
যুক্তরাষ্ট্র	২.৪৫	৭.৫	৩.২১	৯.২	৬.১৭	১৩.৪
নরওয়ে	২.৬৪	৮.০	২.২০	৬.৩	৫.৯৬	১৩.০
মালয়েশিয়া	১.১৪	৩.৫	১.৩৪	৩.৮	৩.৯০	৮.৫
মিশর	০.০	০.০	০.০	০.০	১.৯৯	৪.৩
জাপান	১.১৯	৩.৬	১.৭৫	৫.০	১.৯৩	৪.২
ডেনমার্ক	০.৩১	০.৯	১.৪০	৪.০	১.৮৭	৪.১
দক্ষিণ কোরিয়া	৩.০৭	৯.৪	২.৪৫	৭.০	১.৬২	৩.৫
হংকং-চীন	১.৭১	৫.২	১.১৭	৩.৩	১.৩৪	২.৯
সংযুক্ত আরব আমিরাত	০.০	০.০	১.৬৭	৪.৮	১.২৮	২.৮
নেদারল্যান্ড	২.২০	৬.৭	২.৪৪	৭.০	০.৮৯	১.৯
সুইজারল্যান্ড	০.৪৬	১.৪	০.২০	০.৬	০.৭২	১.৬
ভারত	০.৪৩	১.৩	০.৩৫	১.০	০.৬৮	১.৫
জার্মানী	০.০৬	০.২	০.১২	০.৩	০.৬৮	১.৫
অন্যান্য দেশসমূহ	১৫.৩২	৪৬.৭	৮.৩৮	২৩.৯	৭.৯৫	১৭.৩

মোট	৩২.৮৩	১০০.০	৩৫.০২	১০০.০	৪৬.০৪	১০০.০

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

দক্ষিণ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যেমন, চীন, হংকং, ভারত, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, তাইওয়ান এবং থাইল্যান্ড এর বিনিয়োগ মূলত উৎপাদনমুখী শিল্পভিত্তিক। সার্কভুক্ত দেশের বাইরে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে মূলত এদেশে নতুন বাজার সৃষ্টি এবং উন্নত দেশগুলোর বাজারে এদেশের পণ্যের শুল্ক সুবিধার আওতায় রপ্তানি সুবিধার কারণে। রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত এলাকায় এ কারণে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশীয় দেশগুলোর বিনিয়োগ প্রবাহ অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি।

বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর বিনিয়োগ খুবই কম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো কখনই এদেশে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের ২-৩ শতাংশের বেশি অবদান রাখতে পারেনি। সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে ভারতের বিনিয়োগই কিছুটা চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মোতাবেক ২০০৪ সালে ভারতের বিনিয়োগ ছিল মাত্র ০.৬৮ কোটি ডলার, যা মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের মাত্র ১.৫ শতাংশ। এছাড়া এসময়ে পাকিস্তানের বিনিয়োগ ছিল ০.৩৮ কোটি ডলার এবং শ্রীলংকার বিনিয়োগ ছিল ০.৩৫ কোটি ডলার। অন্যান্য সার্কভুক্ত দেশের কোনো বিনিয়োগ এ সময় হয়নি। এদেশে আলোচিত ভারতীয় বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে এশিয়ান পেইন্টস, এ্যাপোলো হাসপাতাল, রেকিট বেনকিসার, ভিআইপি-নিটোল, মান ফার্মা, সেলো-জিকিউ ইন্ডাস্ট্রিজ, বার্জার পেইন্টস্ এবং ডাটা সফট লিমিটেড। অবশ্য বর্তমানে ভারতের বহুজাতিক কোম্পানি টাটা'র প্রস্তাবিত ২৫০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব আলোচনার শেষে সিদ্ধান্তের পর্যায়ে রয়েছে। এটা বাস্তবায়িত হলে তা হবে এদেশে যে কোনো বৈদেশিক বিনিয়োগের মধ্যে সর্বোচ্চ। টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব সম্পর্কে সেকশন ১০ এ বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

৬. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের খাতভিত্তিক বণ্টন

সাম্প্রতিককালে বৈদেশিক বিনিয়োগের একটি গুণগত পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। পূর্বে স্থানীয় শুল্ক অঞ্চলে বিনিয়োগকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগ কম দেখানো হতো, শিল্পখাতে বিনিয়োজিত বৈদেশিক বিনিয়োগ মূলত শক্তি ও জ্বালানি খাতে লিপিবদ্ধ করা হতো। কিন্তু ২০০২ সালের পরিসংখ্যানে বিনিয়োগের একটি ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায় — সেবছর বৈদেশিক বিনিয়োগের ৪৪ শতাংশ আসে শিল্প খাত থেকে। চিত্র ২ অনুসারে ২০০৪ সালে উৎপাদনমুখী (manufacturing) শিল্প খাতে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে ৩০ শতাংশ, টেলিকম খাতে ২৮ শতাংশ, তেল, গ্যাস ও কয়লা উৎপাদনে ২০ শতাংশ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২০ শতাংশ। মূলত স্থানীয় বাজার, রপ্তানিমুখী শিল্পখাত এবং সেবাখাত ভিত্তিক কর্মকাণ্ডে বৈদেশিক বিনিয়োগ বেশি হয়েছে।

চিত্র ২: বৈদেশিক বিনিয়োগের খাতভিত্তিক বন্টন, ২০০৪

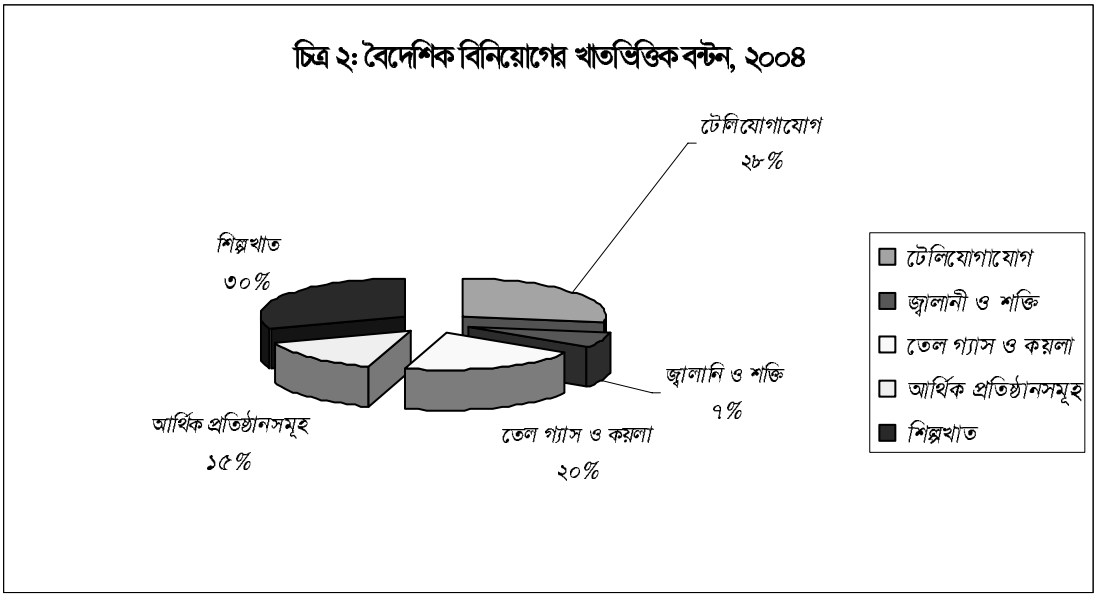

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

বৈদেশিক বিনিয়োগ এর সাথে আমদানি-রপ্তানি কাঠামোর একটা সম্পর্ক রয়েছে। সংজ্ঞানুসারে, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) সকল প্রতিষ্ঠানই রপ্তানিমুখী। সারণি ৫ হতে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের মোট রপ্তানিতে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের অবদান বাড়ছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের অবদান ১৯৯৭ সালের ১০.৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫-৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১৮.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর সাথে স্থানীয় শুল্ক অঞ্চলে অবস্থিত বিদেশী কোম্পানিগুলোর রপ্তানির হিসাব একত্রে করলে দেশের মোট রপ্তানি আয়ে বৈদেশিক বিনিয়োগের অবদান এক-চতুর্থাংশের কম হবে না। বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আমদানি কাঠামোতেও বেশ পরিবর্তন এসেছে। বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষুদ্র একটা অংশ স্থানীয় সম্পদ (যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস, কৃষিভিত্তিক কাঁচামাল) প্রক্রিয়াজাত করে থাকে, আর বড় অংশটি এখনও ব্যাপকভাবে আমদানি নির্ভর — যা মূলধন যন্ত্রপাতি হতে মধ্যবর্তী উপাদান এবং শিল্পজাত কাঁচামাল পর্যন্ত ব্যাপৃত। এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের কারণে বর্ধিত আমদানি চাহিদা মিটিয়ে কতটুকুইবা বিনিয়োগ এ দেশে হয়? এ ব্যাপারে কোনো প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে এটুকু ধারণা দেয়া যেতে পারে যে, বিদেশী কোম্পানিগুলো মূলত ইকুইটি হিসেবে মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানি করে থাকে। এছাড়া মধ্যবর্তী উপাদান এবং শিল্পজাত কাঁচামাল হিসেবে আমদানিকৃত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি পণ্য হিসেবে অথবা সম্ভাব্য আমদানিযোগ্য পণ্যের বিকল্প হিসেবে বাজারজাত করা হয়, যা বৈদেশিক লেনদেনে ধনাত্মক প্রভাব ফেলে। তবে বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেনের ওপর সবচেয়ে বড় চাপ আসে বিনিয়োগ হতে অর্জিত লাভের প্রত্যাবাসনের ফলে, যা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি ৫: মোট রপ্তানিতে ইপিজেডের অবদান

(কোটি মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	চট্টগ্রাম ইপিজেড	ঢাকা ইপিজেড	মংলা ইপিজেড	কুমিলা ইপিজেড	উত্তরা ইপিজেড	ঈশ্বরদী ইপিজেড	ইপিজেড হতে রপ্তানি	মোট রপ্তানি	মোট রপ্তানিতে ইপিজেডের অংশ (শতকরা)
১৯৯৬-৯৭	৩৪.৩০	১১.৯০					৪৬.৩০	৪৪১.৮০	১০.৫
১৯৯৭-৯৮	৪৫.০০	১৮.৬০					৬৩.৬০	৫১৬.১০	১২.৩
১৯৯৮-৯৯	৪৫.২০	২৬.০০					৭১.২০	৫৩১.৩০	১৩.৪
১৯৯৯-০০	৫২.৬০	৩৬.৫০					৮৯.১০	৫৭৫.২০	১৫.৫
২০০০-০১	৬২.০০	৪৪.৮০					১০৬.৮০	৬৪৬.৭০	১৬.৫
২০০১-০২	৬০.৯০	৪৬.৭০	০.২০				১০৭.৭০	৫৯৮.৬০	১৮.০
২০০২-০৩	৬৪.১০	৫৫.৫০	০.৩০	০.১০			১২০.০০	৬৫৪.৫০	১৮.৩
২০০৩-০৪	৬৭.৯০	৬৬.৮০	০.৩০	০.৪০			১৩৫.৪০	৭৫৯.৯০	১৭.৮
২০০৪-০৫	৭৭.২০	৭৫.৮০	০.৮০	১.০০		০.১০	১৫৪.৯০	৮৪৩.৫০	১৮.৪
২০০৫-০৬ (জুলাই-নভেম্বর)	৩৬.১১	৩৪.২৫	০.৩৩	১.২৮		০.০৫	৭২.০০	৪০১.১০	১৮.০

সূত্রঃ *বেপজা ও বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

৭. অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাব

আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের নীট প্রবাহ ৪০ কোটি ডলারের কাছাকাছি এবং মাথাপিছু প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ৩.৬ ডলারের মতো। ক্রমান্বয়ে বেশির ভাগ বৈদেশিক বিনিয়োগ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত এলাকার বাইরে বিনিয়োজিত হচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ দক্ষতা নির্দেশ করে। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা উত্তরোত্তর শিল্পখাতে বিনিয়োগ করছে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের এক চতুর্থাংশ বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে হয়ে থাকে। শিল্পখাতের মোট কর্মসংস্থানের মাত্র ১.৫ শতাংশ বিদেশী

কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে। তবে বৈদেশিক বিনিয়োগের বহুমুখী প্রভাব বিবেচনায় নিম্নে বিস্তারিতভাবে তা আলোচনা করা হলো।

সাধারণভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্রমবর্ধমান প্রবাহ দেশে স্থানীয় বিনিয়োগের ঘাটতি পূরণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে বলে ধারণা করা হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগ অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকার প্রভাব ফেলতে পারে, যার কতকগুলো নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

অ. প্রত্যক্ষ প্রভাব

বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো বৈদেশিক লেনদেন, কর্মসংস্থান এবং রাজস্ব আদায়ে এর প্রভাব।

ক. বৈদেশিক লেনদেনে হিসাবে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাব

বৈদেশিক বিনিয়োগ একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরে মূলধন গঠনে সহায়তা করে, অন্যদিকে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে তা বৈদেশিক লেনদেন হিসাবের ওপর চাপও সৃষ্টি করতে পারে। যদিও এ পর্যন্ত সার্বিক বৈদেশিক বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় মুনাফা প্রত্যাবাসনের প্রভাবও কম ছিল। মুনাফা প্রত্যাবাসনের চাপকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকার রপ্তানিমুখী শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা দেশীয় বাজার ভিত্তিক সেবাখাতমুখী হয়েছে। মুনাফা, ডিভিডেন্ড এবং রয়্যালটি বাবদ ২০০২-০৩ অর্থবছরে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাবাসিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৬.৬ কোটি ডলার, যা ঐ বছর নীট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের চেয়ে ৭ কোটি ডলার বেশি। ফলে বাংলাদেশের মতো একটি মূলধন অন্বেষণকারী দেশ নীট মূলধন রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। সারণি ৬ এ ২০০৫ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৈদেশিক লেনদেন হিসাবে বিদেশী বিনিয়োগের প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। ২০০৫ সালের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের হিসেব মতে, দেশে আগত মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল ৪৪.৭ কোটি ডলার, অন্যদিকে একইসময় প্রত্যাবাসিত মূলধনের পরিমাণ হলো ২৬.৭ কোটি ডলার, অর্থাৎ বৈদেশিক লেনদেন হিসাবে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নীট অবদান ছিলো মাত্র ১৮ কোটি ডলার। এটা দেখা যাচ্ছে যে, বড় বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলো (যেমন টেলিকম কোম্পানি) তাদের অর্জিত লাভের বড় অংশই পুনর্বিনিয়োগ না করে দেশে প্রত্যাবাসন করে বলে বৈদেশিক লেনদেনে চাপ সৃষ্টি হয়। তবে বৈদেশিক লেনদেনের ওপর বৈদেশিক বিনিয়োগের নীট প্রভাব নির্ণয় করতে হলে আমদানি বিল এবং রপ্তানি আয়ের ওপর এর পরোক্ষ প্রভাবও বিবেচনায় নেয়া উচিত। আমদানি বিলের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের দুটি পরস্পর বিরোধী প্রভাব থাকতে পারে। একদিকে বৈদেশিক বিনিয়োগের কারণে বর্ধিত আমদানি বিল মেটাতে গিয়ে অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হতে পারে, অন্যদিকে এটি আমদানিকৃত দ্রব্যের দক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে স্থানীয়ভাবে পণ্য উৎপাদন করে বলে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়ে দিতে পারে।

সারণি ৬: বৈদেশিক লেনদেনে বিদেশী বিনিয়োগের অবদান

(কোটি মার্কিন ডলার)

	জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫	এপ্রিল-জুন ২০০৫	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫	জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০০৫
অ. বৈদেশিক বিনিয়োগ				
প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ	১২.২৫	১১.৫৭	২০.৮২	৪৪.৬৪
অন্তঃপ্রবাহ	১২.৩৭	১১.৬৫	২০.৮২	৪৪.৮৪
বহিঃপ্রবাহ	০.১২	০.০৮	০.০	০.২০
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	০.০	০.০	০.০৭	০.০৭
অন্তঃপ্রবাহ	০.০	০.০	০.০৭	০.০৭
বহিঃপ্রবাহ	০.০	০.০	০.০১	০.০১
আ. নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ	১২.২৫	১১.৫৭	২০.৮৯	৪৪.৭১
ই. আয়ের স্থানান্তর	৫.৭৪	৪.৫৭	১৬.৩৮	২৬.৬৯

রয়্যালটি	০.১০	০.২০	০.০৬	০.৩৫
মুনাফা	৫.৬৫	৪.৩৬	১৬.৩২	২৬.৩৩
ডিভিডেন্ড	০.০	০.০১	০.০	০.০১
ঈ. বৈদেশিক লেনদেনে অবদান (আ-ই)	৬.৫১	৭.০০	৪.৫১	১৮.০২

সূত্রঃ সিপিডি ডাটাবেজ।

খ. কর্মসংস্থান পরিস্থিতি

রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার বাইরে বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের পূর্ণাঙ্গ তথ্য না থাকার কারণে কর্মসংস্থানের ওপর বিনিয়োগের প্রভাব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেয়া কঠিন। ২০০৪ সালে এফআইসিসিআই (Federation of International Chamber of Commerce and Industry) কর্তৃক একটি গবেষণায় দেখা যায়, স্থানীয় শুল্ক অঞ্চলে মোট ১২৯,৫৪৯ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যা দেশের শিল্পখাতের মোট কর্মসংস্থানের ০.৬৮ শতাংশ। বিদেশী কোম্পানিগুলোতে কর্মরত শ্রমিকের সবচেয়ে বড় অংশটি ভোগ্যপণ্য এবং তৈরি পোশাক খাতে নিয়োজিত রয়েছে।

রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে নিয়োগকৃত শ্রমিকের সংখ্যা ২০০২-০৩ অর্থবছরে ১৩০,০০০ জন হতে বেড়ে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ১৪০,০৫০ জনে দাঁড়ায়, যা শিল্পখাতে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের ০.৭৪ শতাংশ। সবমিলিয়ে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল এবং স্থানীয় শুল্ক অঞ্চল মিলিয়ে বিদেশী কোম্পানিগুলোতে সর্বমোট ২.৭ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা শিল্প খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের ১.৫ শতাংশের চেয়ে কম। এটি প্রমাণ করে যে, বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিদেশী কোম্পানিগুলো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে কি না তা দেখার পাশাপাশি এটিও দেখা গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা কোন্ ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের বড় অংশটি মূলত অদক্ষ শ্রমিক ও স্বল্প মজুরিভিত্তিক, একই সাথে এ কর্মসংস্থান ব্যাপক আকারে না হওয়ায় দেশীয় অর্থনীতিতে এর খুব একটা প্রভাব নেই। তবে এটি সম্ভবত রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের বাইরে বিদেশী কোম্পানিগুলোতে মধ্যম এবং শীর্ষ সারির ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্থানীয় পেশাজীবীদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। উঁচু বেতনে স্থানীয় দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োজিত করার ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে এর ধনাত্মক প্রভাব পড়তে পারে যদি তাদের বেশী নিয়োগ দেয়া হয়।

গ. রাজস্ব প্রভাব

বৈদেশিক বিনিয়োগ আমন্ত্রকারী দেশের রাজস্ব আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়, যা প্রকারান্তরে সরকারি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা প্রতি বছর আনুমানিক ১.৩২ কোটি মার্কিন ডলার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে থাকে। তবে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উদার প্রণোদনা নীতি গ্রহণ করার কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেশ আরও বেশি রাজস্ব আয়ের সুযোগ হারাচ্ছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির বিষয়টি মাথায় রেখে নীতিনির্ধারকদের দুটি পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়, অর্থাৎ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং তাকে কর অবকাশ দেয়ার বিপরীতে অর্থনীতির সক্ষমতা আরো ব্যাপকভাবে বাড়ানো, এ দু'টির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

আ. পরোক্ষ প্রভাব

ক. প্রযুক্তি স্থানান্তর

প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাত্রা বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাব বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। যদিও অনেক সর্বাধুনিক প্রযুক্তি বিদেশী কোম্পানিগুলো বাজারজাত করে না, তথাপি উন্নয়নশীল দেশগুলো বৈদেশিক

বিনিয়োগকে জ্ঞানার্জন, স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে। প্রকল্পভিত্তিক বিশেষ গবেষণা ছাড়া প্রযুক্তি স্থানান্তরের সুফল পরিমাপ করা কঠিন।

বিশ্ব অর্থনীতি ফোরাম ও সিপিডি কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত ২০০৫ সালের "বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ" মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় যে, ৮৬ শতাংশ উত্তরদাতা ব্যবসায়ীই মনে করে যে, প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক দিয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য বহু দেশের চেয়ে পিছিয়ে আছে। যদিও তারা বিশ্বাস করে যে, বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রযুক্তি স্থানান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় মাধ্যম। তবে তারা এটিও স্বীকার করে যে, বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে খুব সাধারণ মানের প্রযুক্তি স্থানান্তর হয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে বেশির ভাগ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রযুক্তিঘন না হয়ে নিম্নমানের কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পোশাক প্রস্তুত শিল্পের কথা বলা যায়। এছাড়া ব্যাংকিং, ঔষধ, টেক্সটাইল, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প এবং নির্মাণ খাতে প্রযুক্তি স্থানান্তরের খুব কম ঘটনা চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে এটিও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রযুক্তি এবং দক্ষতা স্থানান্তরের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে বিপরীত ধারার প্রকৌশল (reverse engineering) এবং শ্রমের গতিশীলতাকে বিবেচনা করা হয়।

খ. বাজার উপলব্ধি (Market Intelligence)

বিগত দশকে বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের বেশ পরিবর্তন হয়েছে। বরং আন্তর্জাতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বহুজাতিক কোম্পানির আমদানি, রপ্তানি এবং বণ্টন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। বিদেশী কোম্পানির অত্যধিক মাত্রায় শিল্পজাত কাঁচামাল আমদানির ঘটনা থেকে বলা যায়, এসব কোম্পানি সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের জন্য নিজেদের অধীনস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানির উপর বেশি নির্ভর করছে। উদাহরণস্বরূপ, আশির দশকে দক্ষিণ কোরীয় উদ্যোক্তারা মাল্টিফাইবার এগ্রিমেন্ট (multi fibre agreement) এর আওতায় টেক্সটাইল কোটার সুবিধা কাজে লাগাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে, যা থেকে এদেশে বাজার উপলব্ধির বিষয়টি সঞ্চারিত হয়। ফলশ্রুতিতে বিগত দুই দশকে স্থানীয় উদ্যোক্তারা দক্ষিণ কোরীয়দের অনুকরণ করে নিজেদের উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলে বিদেশে পণ্য বাজারজাত করার দক্ষতা অর্জন করেছে।

এছাড়া ঔষধ, জ্বালানি ও খনিজ এবং সিমেন্ট উৎপাদনে বিদেশী বিনিয়োগও দেশে বাজার সম্পর্কিত উপলব্ধির সঞ্চার করেছে। এ খাতে স্থানীয় উদ্যোক্তারা বিদেশীদের অনুকরণে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের আমদানি এবং টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানী করছে।

গ. বাজারে প্রতিযোগিতা

বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং কর্পোরেট খাতে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক বেশ জটিল। তবে এটা স্পষ্ট যে, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আগমন যেকোনো অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার গতি ত্বরান্বিত করে। বিশেষত যেসব অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার নীতিমালার প্রয়োগ বেশ দুর্বল এবং বাজারে বিভিন্ন এজেন্ট দামকে প্রভাবিত করে, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আগমনে সেখানে প্রতিযোগিতা ত্বরান্বিত হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগের সাথে প্রতিযোগিতা দেশের অভ্যন্তরে দক্ষতা বৃদ্ধি করে, যার ফলে পণ্যের মান উন্নত হয়। দক্ষতা অর্জনের এ বিষয়টি শ্রম এবং মূলধনের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘটে থাকে। এর ফলে পণ্যের মান বৃদ্ধি পায় এবং একক প্রতি পণ্য মূল্য হ্রাস পায়। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের পক্ষে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে টয়লেট্রিজ এবং গৃহস্থালি ব্যবহার্য কেমিক্যাল খাতে দেশী/বিদেশী কোম্পানির বর্তমান প্রতিযোগতার প্রবণতা, যেখানে কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি বাজারের বড় অংশ দখল করে রেখেছে (যেমন, ইউনিলিভার)।

অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বাজার দখলের কৌশল হিসেবে অত্যন্ত কম দামে পণ্য বিক্রয় নীতি (predatory price policy) গ্রহণের কারণে স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পদ্যোক্তারা বাজারে টিকতে পারছে না। ফলে দেশে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেলেও অন্যদের স্থানচ্যুতির মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন হচ্ছে বলে স্থানীয় উৎপাদনকারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ স্থানচ্যুতির কারণে মালিকানা পরিবর্তনের বিষয়টিও লক্ষণীয়।

ঘ. কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (Corporate Social Responsibility)

বর্তমানকালে কর্পোরেটের জনহিতকর কর্মকাণ্ড তার শেয়ারহোল্ডারদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবার বিচারে খুবই জরুরি। তবে একটি প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের মূল বিষয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয়ে কতটা গুরুত্ব দিবে এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে। অবশ্য সিপিডি পরিচালিত জরিপে শ্রমিকরা মনে করে যে, দেশের খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানই স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক মান বজায় রাখে। সিপিডি'র জরিপের বিস্তারিত ফলাফল বক্স ২ এ সন্নিবেশিত হলো।

এক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদনকারী এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। দেখা গেছে যে, বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মচারীদের অধিক সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। অবশ্য বেশ কিছু বিদেশী প্রতিষ্ঠান পরিবেশগত এবং অন্যান্য মান পুরোপুরি বজায় রাখে না, যেগুলো তারা নিজ দেশে ঠিকই মানতে বাধ্য হয়। এফআইসিসিআই-এর পূর্বোক্ত গবেষণা অনুসারে, এদেশে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বশীলতা কার্যক্রমে বার্ষিক প্রায় ১.২ কোটি ডলার খরচ করে, যা বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বাবদ ব্যয়িত বাজেটের মাত্র ১ শতাংশ।

বক্স ২: বাংলাদেশে কর্পোরেট খাতের দায়িত্ব - সিপিডি'র জরিপ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) কর্পোরেট খাতের দায়িত্ব নিয়ে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি এবং এপ্রিল মাসের মধ্যবর্তী সময়ে একটি জরিপ করেছিল। এ জরিপে দেখা যায় যে, এদেশের প্রেক্ষিতে কর্পোরেট খাতের দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপের উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণভাবে কর্পোরেট সেক্টর নিয়ে সুশীল সমাজের ঋণাত্মক মনোভাব রয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিকরা কোনো কোনো ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও সাধারণভাবে কর্পোরেট দায়িত্ব নিয়ে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। কোম্পানিগুলো কর্পোরেট দায়িত্ব চর্চায় নিজেদেরকে নিম্নমানের বলে মনে করে, - মাত্র ৪৬.৭ শতাংশ কোম্পানি তাদের সামগ্রিক কর্মপরিচালনায় কর্পোরেট নীতি প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা দেশের কর্পোরেট চর্চার গুণগত মানের ব্যাপারে আরো ঋণাত্মক মনোভাব পোষণ করে থাকে তাদের মাত্র ১৭.২ শতাংশ মনে করে যে, দেশে সঠিকভাবে কর্পোরেট দায়িত্ব চর্চা করা হয়। ৬২.২ শতাংশ কোম্পানি মানবাধিকারের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে বলে দাবি করলেও সুশীল সমাজের মাত্র ১৬.৭ শতাংশ প্রতিনিধি তা সত্য বলে মনে করে।

কমিউনিটি প্রকল্পে সহায়তার ব্যাপারে ব্যবসায়িক এবং সুশীল সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই, ৩৭.৮ শতাংশ কোম্পানি এধরনের প্রকল্পে সাহায্য করে বলে দাবি করে, অন্যদিকে সুশীল সমাজের ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা তা সমর্থন করে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনা করার ব্যাপারে কোম্পানিগুলো খুব আগ্রহী নয়, ৭৫.৬ শতাংশ কোম্পানি স্বীকার করে যে, তারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে খুব কম আলোচনা করেছে। অন্যদিকে সুশীল সমাজের সদস্যদের মাত্র ৬.৭ শতাংশ মনে করে যে, কোম্পানিগুলো এক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা করে থাকে।

শিশু শ্রমের ব্যাপারে কোম্পানিগুলোর নির্বাহী এবং শ্রমিক উভয়ই মনে করে (যথাক্রমে ৮৩.৩ শতাংশ এবং ৮১.৮ শতাংশ) যে, কোম্পানিগুলোতে শিশুশ্রমের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সুশীল সমাজ এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছে, মাত্র ১৩.৩ শতাংশ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি মনে করে যে, কোম্পানিগুলোতে কোনো শিশুশ্রম নেই। কোম্পানিগুলোতে অতিরিক্ত সময় (overtime) ধরে কাজ করার ঘটনার বিষয়ে সুশীল সমাজের সাথে কোম্পানি ও শ্রমিকদের মতের পার্থক্য চোখে পড়ে। ৭১.১ শতাংশ কোম্পানি এবং ৬৩.১ শতাংশ শ্রমিক মনে করে যে, অতিরিক্ত সময় কাজ করার ঘটনা কোম্পানিগুলোতে রয়েছে, অন্যদিকে সুশীল সমাজের ৯৩.৩ শতাংশ প্রতিনিধি কোম্পানিগুলোতে অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ করার ঘটনা খুবই সাধারণ বলে মনে করে। সর্বনিম্ন মজুরির ব্যাপারে সুশীল সমাজ এবং শ্রমিকরা প্রায় একই মত পোষণ করে, মাত্র ৩৩.৩ শতাংশ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং ৪২.২ শতাংশ শ্রমিক মনে করে যে, কোম্পানিগুলো সর্বনিম্ন মজুরি দিয়ে থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ কোম্পানি (৮১.১ শতাংশ) দাবি করে যে, তারা "জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম মজুরি" দিয়ে থাকে, যা সব সময় সর্বনিম্ন মজুরির সমান নাও হতে পারে।

কোম্পানির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৪৫.৩ শতাংশ শ্রমিক উচ্চমানের কথা বললেও, মাত্র ৩৫.৬ শতাংশ কোম্পানি প্রতিনিধি তা সমর্থন করে। কোম্পানি এবং শ্রমিকদের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিয়ে মতের এ আপাত নৈকট্য দুর্বল তথ্য আদান প্রদান অথবা শ্রমিকদের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য হতে পারে। অন্যদিকে সুশীল সমাজ এ সংক্রান্ত বিষয়ে অত্যন্ত ঋণাত্মক ধারণা পোষণ করে, তাদের মাত্র ১৬.৭ শতাংশ কোম্পানিগুলোর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। কোনো শ্রমিকই মনে করে না যে, তাদের কোম্পানি পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করে থাকে। অন্যদিকে ৮.৯ শতাংশ কোম্পানি এ ধরনের আইন ভঙ্গের কথা স্বীকার করেছে। এই ইস্যুতেও সুশীল সমাজের মনোভাব অত্যন্ত ঋণাত্মক,

৮৩.৩ শতাংশ প্রতিনিধি মনে করে যে, কোম্পানিগুলো নিয়মিত এ ধরনের আইন ভঙ্গ করে থাকে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যাপারে কোম্পানি এবং শ্রমিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। প্রায় ৪৪ শতাংশ কোম্পানি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক মান রক্ষা করে বলে দাবি করলেও ৭১.১ শতাংশ শ্রমিক মনে করে যে, তাদের কোম্পানিগুলো স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক মান ভঙ্গ করে।

সূত্রঃ রায়হান (২০০৩)।

৮. বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ

বাংলাদেশ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের পরিমাণ বাড়াতে ক্রমশ বৈদেশিক বিনিয়োগের ওপর বেশি গুরুত্ব দিলেও দারিদ্র্য দূরীকরণে তা কতটুকু ভূমিকা পালন করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দেশের ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করায় বৈদেশিক বিনিয়োগের দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের মধ্যে সম্পর্ক বেশ জটিল। বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান এবং আয় বাড়ানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রভাব ফেলে। অথচ সাম্প্রতিককালে সরকারের গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্পর্কে খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত কোনো সূচক নির্ধারণের উদ্যোগও নেয়া হয়নি।

অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র অনুসারে নব্বইয়ের দশকে প্রতিবছর ১ শতাংশ হারে দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে, অন্যদিকে একই সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৮ শতাংশ। অন্য কথায়, একই ধরনের আয় বণ্টন বজায় থাকলে প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ৪.৮ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন। ভট্টাচার্য এবং দেব (২০০৪) এর মতে, ১০ শতাংশ হারে বৈদেশিক বিনিয়োগ হলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ৩.৭১ শতাংশ। ফলে ১ শতাংশ দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগের ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন। অতএব বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

২০০৫ সালের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মধ্যে কোনো সরাসরি সম্পর্কের কথা না বলা হলেও বিনিয়োগ পরিবেশ যে সাধারণভাবে প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা বলা হয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুসারে, বিনিয়োগ পরিবেশের অবদান দুই ভাবে দেখা যায়। প্রথমত, সামষ্টিকভাবে উন্নত পরিবেশের মাধ্যমে অর্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করে; দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নের ফলে শ্রমিক, উদ্যোক্তা, ভোক্তা এবং নাগরিক হিসেবে জনগণের জীবনযাত্রার মান এবং একই সাথে সরকার প্রদত্ত সেবার (public goods and services) মান উন্নত হয় যা দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক।

এটা স্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও পর্যাপ্ত নয়। কেননা উচ্চ প্রবৃদ্ধির সময়েও আয় বণ্টনের অবনমন হতে পারে। বাংলাদেশে মাথা পিছু (head-count) দারিদ্র্যের অনুপাত হ্রাস পেলেও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পদশালী লোকের জন্য আশীর্বাদ হলেও দরিদ্র লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পাবলিক পণ্য বা সার্ভিস পাবার সুযোগে বাধা প্রদান করছে।

৯. মানসম্পন্ন বৈদেশিক বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য

দারিদ্র্য বান্ধব প্রবৃদ্ধি এবং আয়ের সাম্যতা দারিদ্র্য হ্রাসে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। নিচে বৈদেশিক বিনিয়োগের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো, যা দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই মানব উন্নয়নের ন্যূনতম নিশ্চয়তা প্রদান করে। এগুলো হলোঃ

- ইকুইটি অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় মূলধন এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ সহযোগে যৌথ উদ্যোগে প্রকল্প স্থাপন;
- শ্রমনিবিড় শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন;
- রপ্তানিমুখী শিল্পে বিনিয়োগ;
- স্থানীয় কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ;
- উপশহরে শিল্প স্থাপন;
- ব্যাপক অগ্র- ও পশ্চাদমুখী শিল্পের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ;
- কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বের ভালো রেকর্ড স্থাপন।

বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৫ এ বিদেশী বিনিয়োগকে আলাদা ক্যাটাগরিতে বিবেচনা না করার ফলে এ প্রতিবেদন বৈদেশিক বিনিয়োগের গুণগত বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে গেছে। তবে এতে বৈদেশিক বিনিয়োগের কিছু ভালো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, প্রতিবেদনটিতে ১০০ শতাংশ ইকুইটিতে বিদেশী বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনের মতে, যৌথ উদ্যোগের বাধ্যবাধকতা একটি দেশে বিনিয়োগে আগ্রহ সৃষ্টি করার চেয়ে বাধার সৃষ্টি করতে পারে এবং বিদেশী কোম্পানিগুলোকে উন্নত ও সংবেদনশীল কারিগরি প্রক্রিয়া ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে পারে, যা প্রকারান্তরে বিনিয়োগ থেকে বাড়তি-ফল (spill-over effect) পাওয়ার সুযোগ কমিয়ে দেয়। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যৌথ উদ্যোগ বিনিয়োগ হলে তা স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরিতে, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও এর ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান উপলব্ধি (know how intelligence) এবং স্থানীয় অর্থনীতির সাথে সমন্বয় সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ

বিদেশী উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিকতর দারিদ্র্য-বান্ধব ভূমিকা নিশ্চিত করা যেতে পারে। এছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে তা বিক্রি করে দেয়া যেতে পারে।

খ. শ্রমনিবিড় বৈদেশিক বিনিয়োগ

শ্রমনিবিড় বৈদেশিক বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ টেক্সটাইল এবং তৈরি পোশাক শিল্পের কথা বলা যায়, যেখানে বিপুল পরিমাণে আধা-দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত দুই-তৃতীয়াংশের বেশি হলো মহিলা শ্রমিক। এ ধরনের শ্রমনিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থা নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সাথে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরো বেশি স্বাধীনতা, বিশেষত মাতৃস্বাস্থ্য এবং ভাল কাজের পরিবেশের জন্য আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, দারিদ্র্য দূরীকরণে উপার্জনকারী মহিলাদের ব্যয় কাঠামো তাদের পুরুষ সঙ্গির ব্যয় কাঠামোর চেয়ে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বৈদেশিক বিনিয়োগ নমনীয় কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে সাব-কন্ট্রাকটিং ধরনের কাজ এবং একইসাথে গৃহস্থালি কাজ করার সুযোগ দিলে মহিলাদের অধিকতর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা প্রতিকূল কাজের পরিবেশ, কম মজুরি, শিশু শ্রম ইত্যাদি সম্ভাব্য সমস্যার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। সরকারের পক্ষ থেকে তৈরি পোশাক শিল্প হতে সাফল্যজনকভাবে শিশু শ্রম দূর করার পাশাপাশি শিশুদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার কৌশল হিসেবে পোশাক শিল্পের মতো বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত

হয়েছে। এটা বোঝা গেছে যে, বাজার অন্বেষণকারী ও দক্ষতা অন্বেষণকারী উভয় ধরনের বৈদেশিক বিনিয়োগই শ্রমনিবিড় হতে পারে এবং তৈরি পোশাক খাত-এর একটা ভালো উদাহরণ।

গ. অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ

দেশের অবকাঠামোগত দুর্বলতা বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ-ব্যয় বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। ভালো অবকাঠামো যেমন একদিকে নির্ভরযোগ্য পরিবহণ বা উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজার সুবিধা তৈরি করে, অন্যদিকে তা কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে। অবকাঠামো খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ একইসাথে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনউপযোগমূলক (public utility) সেবাখাতের খরচ হ্রাস করে। এ ধরনের বৈদেশিক বিনিয়োগ সরকারকে অন্যান্য সামাজিক খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি সম্পদ অবমুক্ত করতে সহায়তা করে।

সরকার বেশ সক্রিয়তার সাথে উদার বিনিয়োগ নীতির আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করে আসছে। সাম্প্রতিককালে সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বমূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি অবকাঠামো খাতে এ ধরনের অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগের সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনে বিদেশী বিনিয়োগ রয়েছে।[১২] অবশ্য কোনো কোনো অবকাঠামো খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়া জরুরি। দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট পরিসেবা উচ্চমূল্যে ক্রয়ের মতো পরিস্থিতি থেকে সর্বাপেক্ষা বিপদগ্রস্ত গ্রুপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভরতুকির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য সরকারকে এসব আনুষাঙ্গিক দায়ভার নেয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকাও জরুরি।

দেশে বর্তমানে অবকাঠামো খাতে তৈরি-পরিচালনা-মালিকানা (BOO) এবং তৈরি-পরিচালনা-হস্তান্তর (BOT) শর্তের অধীনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগ বিনিয়োজিত রয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে স্বাধীন ও এককভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ কাজ করছে। এছাড়া বৃহদাকার সেতু নির্মাণেও বিদেশী বিনিয়োগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলো প্রাকৃতিক গ্যাস ড্রিলিং এবং পাইপিং এর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য আবশ্যকীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদির যোগান দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ঘ. গ্রাম এবং উপ-শহরে বৈদেশিক বিনিয়োগ

রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে গড়ে ওঠা তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। সারণি ৫ থেকে দেখা যায়, দেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা ইপিজেডে সর্বাপেক্ষা বেশি বিনিয়োগ ও রপ্তানি হলেও ধীরে ধীরে অন্যান্য ইপিজেডও বিনিয়োগ ও রপ্তানিতে ভূমিকা রাখছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। অতীতে এসব ইপিজেড পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেনি এবং এসব এলাকা থেকে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তরের সুফল পার্শ্ববর্তী এলাকায় পৌঁছায়নি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু রাজস্ব সুবিধা থাকলেও অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে সংশ্লিষ্ট ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সেসব রাজস্ব সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। এসব ইপিজেডে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন জরুরি।

১০. টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব পর্যালোচনা

[১২] এছাড়া কয়লা উত্তোলনে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করে ও রপ্তানির সুযোগ রেখে "জাতীয় কয়লা নীতি"র খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এশিয়ান এনার্জি ও ভারতের টাটা সহ বেশ কিছু বিদেশী কোম্পানি কয়লা উত্তোলন করে এর বৃহদাংশ বিদেশে রপ্তানি করতে আগ্রহী।

ভারতের বহুজাতিক কোম্পানি টাটার ২৫০-৩০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব বাংলাদেশে ব্যাপক আগ্রহের সূচনা করেছে। টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে তা হবে এ পর্যন্ত মজুদ দেশের মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের তিন-চতুর্থাংশের সমান।[১৩] টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে ৪ লক্ষ ২০ হাজার টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন স্টীল কারখানা, ১০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট এবং বার্ষিক ১০ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন সার কারখানা। টাটার মতে, তাদের এ বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২৪,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, এছাড়া আরো ১ লক্ষ পরিবার এ থেকে উপকৃত হবে।[১৪] এছাড়া ইকোনমিষ্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট (২০০৫) এর মতে, ২০১০-২০১৫ সালের মধ্যে টাটার বিনিয়োগের মাধ্যমে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াবে মোট জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ, বিদ্যুৎ প্লান্টে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে তা মোট জাতীয় আয়কে বাড়াবে ০.১-০.২৩ শতাংশ, এবং সার্বিকভাবে এ বিনিয়োগ দেশের মোট জাতীয় আয় ১.৯ শতাংশ বাড়াবে। একটি মানসম্পন্ন বৈদেশিক বিনিয়োগ হিসেবে টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে — কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত আনা, দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি হ্রাস এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় আয়ে অবদান ইত্যাদি বিষয়গুলো সত্যি হলে এটা একটা ভালো বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। দুঃখের বিষয়, সরকারের পক্ষ থেকে এধরনের বড় বিনিয়োগের ফলে সামগ্রিক অর্থনীতিতে কি প্রভাব পড়বে, তা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি। একইসাথে এধরনের বিনিয়োগের বিপরীতে টাটার প্রত্যাশিত ভৌত, আর্থিক এবং অন্যান্য সুবিধাদির ছায়া-মূল্য (shadow price) কত এবং দেশের সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রেক্ষিতে এসব দাবি কতটুকু মেটানো সম্ভব হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালোভাড়ো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সব মিলিয়ে বৃহদাকার এবং বহুখাত ভিত্তিক বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবের লাভ-ক্ষতি বিবেচনার জন্য একটি বেঞ্চমার্ক স্টাডি (benchmark study) থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা টাটার সাথে নেগোসিয়েশন শুরুর পর থেকে প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয়েছে।

টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাবের ব্যাপারে সরকারের কারিগরি, অর্থনৈতিক ও সর্বোপরি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জড়িত ছিল বলে বিনিয়োগ বোর্ডের পক্ষে এককভাবে তা নিয়ে আলোচনা সম্ভব ছিল না। এ ধরনের বিশাল বিনিয়োগের জন্য যে ধরনের ভৌত অবকাঠামো দরকার, তা এদেশে নেই; যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের নিশ্চয়তা চাওয়া হয়েছে তাও রয়েছে অপ্রতুল পরিমাণে। উপরন্তু টাটার পক্ষ থেকেও অন্যান্য সমজাতীয় বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে অনেক ক্ষেত্রে বেশি মাত্রায় বিনিয়োগ প্রণোদনা ও সুবিধা চাওয়ার কারণে সার্বিকভাবে সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি নেগোসিয়েশন কমিটি গঠন করা হয়। শুরুতে এ কমিটির প্রধান ছিলেন অর্থসচিব, পরবর্তীতে যোগাযোগ সচিব সে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন শিল্প সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, অতিরিক্ত সচিব আইন মন্ত্রণালয়, ভূমি সচিব, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যপ্রাচ্য ও এশীয় অঞ্চলের মহাপরিচালক। আলোচনার শুরুতে ঠিক হয় যে, ২৫ মে থেকে ৩১ আগস্ট ২০০৫ এর মধ্যে নেগোসিয়েশন শেষ করে ৩০ নভেম্বর ২০০৫ টাটা ও সরকারের মধ্যে বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। পরবর্তীতে আলোচনা দীর্ঘায়িত হতে থাকে এবং ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তে এসেও আলোচনা শেষ করা যায়নি। নেগোসিয়েশন পর্যায়ের সমস্ত রাউন্ডগুলোর মূল বিবেচ্য বিষয়, টাটার প্রস্তাব, সরকারের অবস্থান এবং পরবর্তীতে করণীয় বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তাকারে সারণি ৭ এ সন্নিবেশিত হলো।

প্রথম রাউন্ডের আলোচনায় টাটা বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোর বিষয়ে তার দাবি তুলে ধরে। এর মধ্যে রয়েছে ৩০০০ একর জমি, ৩০ বছরে ২ টিসিএফ গ্যাস সরবরাহ সুবিধা, বড় পুকুরিয়ায় ওপেনপিট পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন, এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সুবিধা ইত্যাদি। সরকার এ পর্যায়ে কোনো প্রতিশ্রুতিতে না গিয়ে টাটার চাহিদাকে বাস্তবসম্মত পর্যায়ে নামিয়ে আনতে বলে। বস্তুত টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে সরকারের কোনো বেঞ্চমার্ক স্টাডি না থাকায় কোনো ধরনের নেগোসিয়েশন করা কষ্টকর ছিল। এ

[১৩] বিশ্ব বিনিয়োগ রিপোর্ট ২০০৫ অনুসারে, বাংলাদেশে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের মজুদ ৩৪০ কোটি ডলার।

[১৪] মানজার হোসাইন, ২০০৫, প্রথম আলোতে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তারিখে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে।

পর্যায়ের আলোচনা শেষে সরকার ইস্পাত কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহকালে জাতীয় গ্রিডে সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য এবং সীমান্ত বাণিজ্যে রেল সুবিধা ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন পরামর্শক নিয়োগ করে।

দ্বিতীয় রাউন্ডের আলোচনা ১৯ জুন ২০০৫ শুরু হবার কথা থাকলেও ২-৭ জুলাই ২০০৫ অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে টাটা অবকাঠামোগত দাবি দাওয়ার পূর্বে-উত্থাপিত প্রস্তাবগুলো পরিমার্জন ও নতুন বিষয় সংযুক্ত করে সরকারের কাছে উত্থাপিত করে। যেমন, ইস্পাত কারখানা ভেড়ামারায় স্থাপনের সরকারি প্রস্তাবে সম্মতি, গ্যাসের চাহিদা কমিয়ে আনা, বিকল্প রেল স্টেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ইত্যাদি। সরকার প্রচলিত আইনি ও নীতি কাঠামোর ভিতর দিয়ে এসব নেগোসিয়েশন চালাতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নীতির অভাব বোধ করে। যার ফলশ্রুতিতে সরকারের পক্ষ থেকে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। সরকার ভৌত অবকাঠামোর বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হলেও গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চয়তার বিষয়টি এ রাউন্ডেও অমীমাংসিত থেকে যায়। এ পর্যায়ে টাটা ১.৩৪ টিসিএফ গ্যাস চাহিদা, ফুলবাড়ী ও বড় পুকুরিয়ায় ৪টি ক্ষেত্রে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের সুযোগ, বিকল্প রেল স্টেশন, বিশেষ কর ব্যবস্থার প্রস্তাব করে। ভূমি, রেল যোগাযোগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলেও কর কাঠামো ও গ্যাস ও বিদ্যুতের দামের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

তৃতীয় রাউন্ডের আলোচনায় ভৌত সুবিধাদির পাশাপাশি রাজস্ব সুবিধাদির বিষয়ে আলোচনা হয়। টাটা ইপিজেডের সমপর্যায়ের সুবিধা, সার কারখানায় ২০ বছর ও ইস্পাত কারখানায় ২৫ বছর গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা ও ৩০ বছরের জন্য ১.৫ টিসিএফ গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা (গ্যারান্টি) চায়। বাংলাদেশ পক্ষ হতে ২০ বছরের বেশি গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা ও ৬ বছরের বেশি কর অবকাশ সুবিধা না দেয়ার কথা জানানো হয়।

চতুর্থ রাউন্ডের আলোচনা কয়েক দফা পিছিয়ে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ এ অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ের আলোচনায় গ্যাসের দামের বিষয়টি মুখ্য ইস্যু হয়ে ওঠে। টাটা প্রতি কিউবিক মিটার গ্যাস ১ ডলারে কেনার ব্যাপারে আগ্রহী হলেও সরকারের পক্ষ থেকে এ মূল্যে গ্যাস সরবরাহে অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেয়া হয়। সরকার একই সাথে গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং ভরতুকি মূল্যে গ্যাস সরবরাহ করতে অসম্মতি জানায়। আলোচনা কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়। বস্তুত টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব এখন গ্যাসের মূল্যের সাথে জড়িয়ে আছে। ফেব্রুয়ারি ২০০৬ এর মধ্যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে[১৫]।

নি:সন্দেহে এত বড় একটি বিনিয়োগ চুক্তি চূড়ান্ত করা একটি দুরূহ কাজ। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেই তাই বাংলাদশের নেগোসিয়েশন টীমগুলোকে কাজ করতে হচ্ছে। টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের পর্যাপ্ত নীতির অভাব (যেমন: কয়লা নীতি না থাকা (বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন), অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং তা সংস্কারের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা, বিশেষ রাজস্ব সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সাথে চুক্তির ব্যত্যয় পরিমাপ করতে না পারা, গ্যাসের দাম কত হওয়া উচিত সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাব, প্রয়োজনীয় প্রাক-প্রস্তুতির অভাব এবং সর্বোপরি সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন না থাকার জন্য একটি "প্যাকেজ প্রস্তাব" হিসেবে টাটার সাথে নেগোসিয়েশন করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথচ এ জাতীয় নেগোসিয়েশনে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনায় দীর্ঘসূত্রতার বড় কারণ এটি। পরবর্তীকালে বৃহৎ বিনিয়োগ প্রস্তাব পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বর্তমান অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে একটি দীর্ঘমেয়াদি নীতি কাঠামো ও নেগোসিয়েশন কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

[১৫] এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে টাটা'র বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন করে একটি রিপোর্ট প্রদান করে। এ রিপোর্টে টাটার বিনিয়োগের ফলে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক লেনদেন হিসাবে উন্নতি, এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে।

সারণি ৭: টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে টাটা ও সরকারের মধ্যে আলোচনার ঘটনাপঞ্জি

রাউন্ড	টাটার প্রস্তাব	সরকারের অবস্থান	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	মতামত
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০ এপ্রিল, ২০০৫	• ১০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুত প্ল্যান্ট, ৪২০,০০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইস্পাত কারখানা এবং ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন সার কারখানায় ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ		• ২৫ মে আলোচনা শুরু হবে • ৩১ আগস্ট আলোচনা শেষ হবে • বিনিয়োগ চুক্তি ৩০ নভেম্বরের মধ্যে স্বাক্ষরিত হবে	
প্রথম রাউন্ড (২৫-২৮ মে, ২০০৫)	• বড়পুকুরিয়ায় ওপেনপিট পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন (৩ মিলিয়ন টন স্টিল মিলের জন্য ও ৩ মিলিয়ন টন রপ্তানির জন্য) • ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন নিজস্ব বিদ্যুত প্রকল্প • বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়ে পণ্য রপ্তানির সুযোগ • ৩০ বছরে ২ টিসিএফ গ্যাসের নিশ্চয়তা • গ্যাস পাইপলাইন উন্নতকরণ • ৩০০০ একর জমি (ইস্পাত কারখানার জন্য ঈশ্বরদীতে ২০০০ একর, বিদ্যুত প্রকল্পের জন্য বড়পুকুরিয়ার নিকট ৬০০ একর এবং সার কারখানার জন্য চট্টগ্রামে ৪০০ একর) • বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা • বিদ্যুত সরবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড হতে বিশেষ সুবিধা	• সরকার জুনের মধ্যে টাটার নিকট ওপেনপিট পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনে কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই রিপোর্ট চেয়েছে • জমির চাহিদার পরিমাণ কমিয়ে আনা • ১৫ বছরের গ্যাস সরবরাহ নিশ্চয়তা প্রদান ও বাকি ১৫ বছর গ্যাসের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করবে • টাটা নিজেই গ্যাস পাইপলাইন উন্নত করতে পারে • টাটা উৎপাদিত বিদ্যুত ক্রয়ে সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করবে • টাটার জন্য বিশেষ বিনিয়োগ অঞ্চল গড়ে তোলা হবে	• ইস্পাত কারখানায় বিদ্যুত সরবরাহ করলে জাতীয় বিদ্যুত গ্রিডে কোনো সমস্যা হবে কিনা এ বিষয়ে পরামর্শক নিয়োগ • সীমান্ত বাণিজ্যে রেল সুবিধা ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পরামর্শক নিয়োগ (এক্ষেত্রে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব ভারতের সংশ্লিষ্ট সচিবের নিকট চিঠি লিখবেন) • পরবর্তী আলোচনা ১৯ জুন শুরু হবে	• ওপেন পিট পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন নীতির অভাব • টাটার জন্য আলাদা বিনিয়োগ অঞ্চল গড়ে তোলার নীতি বাংলাদেশের আছে • ভারতের সাথে সরাসরি রেল যোগাযোগ নেই • কয়লা বেশি পরিমাণে রপ্তানির সুযোগ না দিয়ে অতিরিক্ত কয়লাকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা উচিত • জাতীয় বিদ্যুত গ্রিডের সামর্থ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব • যেহেতু গ্যাসের মজুত নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে, সেহেতু নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা দেয়ার বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ • জমি বরাদ্দকালে জমি স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত • গ্যাস পাইপলাইন যথেষ্ট উন্নত নয় • বিনিয়োগ আলোচনা চালিয়ে নিতে স্থায়ী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন
দ্বিতীয় রাউন্ড (২-৭ জুলাই, ২০০৫)	• ইস্পাত কারখানার স্থাপনের জন্য বিকল্প হিসেবে ভেড়ামারার প্রস্তাব গ্রহণ • গ্যাস মজুদ সম্পর্কে সরকারি হিসাব • বিতর্ক অবসানে ব্রিটিশ পদ্ধতির ব্যবহার • ২ টিসিএফের পরিবর্তে ১.৩৪ টিসিএফ গ্যাসের চাহিদা • ফুলবাড়ী ও বড়পুকুরিয়ায় ৪ টি ক্ষেত্রে কয়লা উত্তোলনের সুযোগ • ভেড়ামারায় বিকল্প রেলস্টেশন স্থাপন • বিশেষ কর পদ্ধতি	• গ্যাস মজুদ সম্পর্কে কোনো হিসাব দিতে অস্বীকৃতি • বিতর্ক অবসানে সরকারি ভূমি আইনের ব্যবহার • ২০ বছরের গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা পেতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুত উৎপাদন করতে হবে (১.২৫ টিসিএফ গ্যাস সরবরাহ করা হবে) • ফুলবাড়ীর পরিবর্তে অন্য দুটি ক্ষেত্রে কয়লা উত্তোলনের সুযোগ • বর্তমান কর পদ্ধতি	• পরবর্তী ১.৫ মাসে টাটা ইস্পাত কারখানা সম্পর্কিত বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রকাশ করবে • ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যমুনা বহুমুখী সেতুর উদাহরণ অনুসরণ করা হবে • ভারত-বাংলাদেশ রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নত রেল যোগাযোগ চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পরামর্শক নিয়োগ • ভেড়ামারায় ইস্পাত কারখানার জন্য রেলওয়ের ১০৭০ একর জমি পছন্দ • কর কাঠামো এবং গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম নির্ধারণে ২৫ জুলাই আবার বৈঠক	• কিছুটা দেরীতে ২য় রাউন্ডের আলোচনা শুরু • বৈদেশিক বিনিয়োগকারী ও সরকারের মধ্যে বিতর্ক অবসানে আন্তর্জাতিক মানের পদ্ধতি চালু করা উচিত • বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারকে পরামর্শ দিতে অর্থনীতিবিদদের দ্বারস্থ হওয়ার মাধ্যমে দরকষাকষিতে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে • অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সরকারের আলোচনার ফলে বিনিয়োগ আলোচনায় সময়ক্ষেপণ হবে • টাটাকে বিশেষ রাজস্ব সুবিধা প্রদান করলে অন্যান্য বিদেশী ও দেশীয় বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে • বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিকট গ্যাস বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দাম সংক্রান্ত নীতিমালার অভাব
তৃতীয় রাউন্ড (২-৫ অক্টোবর, ২০০৫)	• ইপিজেডের সমান সুবিধা • সার কারখানায় ২০ বছর ও ইস্পাত কারখানায় ২৫ বছর গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা • ভূমির দ্রুত হস্তান্তর • যৌথ গবেষণায় গ্যাসের একটি সর্বনিম্ন মজুদ নির্ধারণ করা হবে (যার নিচে মজুদ নেমে গেলে অন্যান্য গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে শুধু টাটাকে সরবরাহ করা হবে) • গ্যাস মজুদের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান • ৩০ বছরের জন্য ১.৫ টিসিএফ গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা	• ইপিজেডের সমান সুবিধা প্রদান করা হবে না • ২০ বছরের গ্যাস সরবরাহ নিশ্চয়তা • গ্যাস মজুদ সম্পর্কে নিশ্চয়তার পরিবর্তে লিক্যুইডিটি ডেমেজ (এলডি) পদ্ধতির ব্যবহার • ৬ বছরের বেশি কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করা হবে না (বিদ্যুত প্রকল্পের জন্য ১৫ বছর) • ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করবে • সরকার ৩ বছর করছাড় দিবে	• কর অবকাশ সম্পর্কিত সরকারি প্রস্তাবে টাটার সম্মতি • পেট্রোবাংলা ওপেনপিট পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন সংক্রান্ত টাটার প্রস্তাবে সম্মত • বড়পুকুরিয়ার একটি অংশ টাটাকে হস্তান্তর করতে সরকার সম্মত	• কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুত ক্রয়সংক্রান্ত নীতিমালার অভাব • সরকার বিভিন্ন বিষয়ে ৫ জন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ করার ফলে দরকষাকষি সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে
চতুর্থ রাউন্ড (৭-৮ জানুয়ারী এবং ৬-৮ ফেব্রুয়ারি)	• ১০ বছর কর অবকাশ সুবিধা • টাটা নিজের সুবিধামত যেকোনো ৬ বছর কর অবকাশ সুবিধা ভোগ করতে চায় • চাকুরীজীবীদের আয়ে করছাড় • প্রতি হাজার কিউবিক মিটার গ্যাসের দাম ১ মার্কিন ডলার • একক মালিকানায় বড়পুকুরিয়ায় ওপেনপিট পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন • কয়েকটি গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস তাকেই সরবরাহ করার প্রস্তাব	• আইপিপি পদ্ধতিতে বিদ্যুত উৎপাদন করলে বিদ্যুত উৎপাদন প্লান্টে ১৫ বছর কর অবকাশ সুবিধা • ২০ বছরের গ্যাস সরবরাহ সুবিধা (প্রয়োজনে মিয়ানমার হতে গ্যাস আমদানি করবে) • ১ মার্কিন ডলার প্রতি হাজার কিউবিক মিটারে গ্যাস বিক্রয় অসম্ভব • বড়পুকুরিয়ায় যৌথ মালিকানায় কয়লা উত্তোলন • কয়েকটি গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস তাকেই সরবরাহ করার প্রস্তাব নাকচ	• চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জনাব ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মূল্যায়নের জন্য সরকার অপেক্ষা করছে • গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের নিকট প্রেরণ • এই রাউন্ডে একমাত্র সিদ্ধান্ত হচ্ছে সরকার গ্যাস মজুদ বিষয়ে হিসাব প্রদান করবে • টাটা ১৫ দিনের মধ্যে সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করবে • সরকার স্বল্প মেয়াদে গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করবে যাতে টাটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ নিতে পারে	• আলোচনায় সরকারের যথেষ্ট প্রস্তুতির অভাবে সময়ক্ষেপণ • রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান ৫-৬ বছর কর অবকাশ সুবিধা পেয়ে থাকলেও এশিয়ান এনার্জি ৯ বছর কর অবকাশ সুবিধা পাওয়ায় টাটা ১০ বছর কর অবকাশ সুবিধা চাচ্ছে (এনবিআর ৬ বছরের অধিক সুবিধা দিতে চাচ্ছে না) • কাফকোকে ১.২ মার্কিন ডলার প্রতি হাজার কিউবিক মিটারে গ্যাস সরবরাহ করলেও এক্ষেত্রে এই উদাহরণ প্রযোজ্য নয় যেখানে স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা ২.৩৫ মার্কিন ডলার প্রতি হাজার কিউবিক মিটারে গ্যাস পেয়ে থাকে। বিদেশী গ্যাস উত্তোলকদের নিকট হতে ২.৮ মার্কিন ডলার প্রতি হাজার কিউবিক মিটারে গ্যাস কেনার কারণে দাম ৩.৫-৪ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা উচিত। সেক্ষেত্রে মিয়ানমার থেকে গ্যাস আমদানির প্রয়োজন হলে চুক্তিতে দাম বৃদ্ধির সুযোগ রাখা উচিত।

১১. উপসংহার

বাংলাদেশকে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হলে অবকাঠামোগত সুবিধা এবং সেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়াও রাজস্ব সুবিধা (যেমন প্যারা-ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ, অশুল্ক বাধা অপসারণ), আর্থিক সুবিধা (যেমন সুদের হার কমানো) এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা (যেমন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং-এর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি) সহ একটি সঙ্গতিপূর্ণ প্রণোদনা প্যাকেজের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষত টাটার মতো বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বৈশিষ্টের আলোকে সুবিধা, ছাড়সহ প্যাকেজ প্রণোদনা ইত্যাদি নির্ধারণের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। বৈদেশিক বিনিয়োগ যেহেতু স্থানীয় বিনিয়োগকে অনুসরণ করে, তাই স্থানীয় বিনিয়োগের পরিমাণ কম হলে বৈদেশিক বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়। এছাড়াও ব্যবসায়ের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক সুশাসনের উন্নতির মাধ্যমে স্থানীয় বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে নিজের স্বার্থ সংরক্ষণে বহুজাতিক পর্যায়ের দরকষাকষিতে নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উরুগুয়ে রাউন্ডে ট্রিমস, ট্রিপস এবং গ্যাটস এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে স্বল্পোন্নত দেশের ইস্যুগুলোর ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য উন্নত দেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলোতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় মর্যাদা এবং ইকুইটিতে অংশীদারিত্বের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই বিদেশী কোম্পানিগুলোকে কাজ করার অনুমতি প্রদানের জন্য দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তির ব্যাপারে চাপ দিয়ে আসছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবাধ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং এতদসঙ্গে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের মতো বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সমান সুবিধা দেবার বিপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। কারণ এধরনের সুবিধা পেলে উন্নয়নশীল দেশগুলো বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ এবং মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারাবে, বৈদেশিক লেনদেন হিসাবে ঝুঁকি বাড়বে, দুর্বল এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতে দেশীয় বিনিয়োগকারীদের সুবিধা প্রদানের নীতি বাতিল করতে হবে, প্রযুক্তি স্থানান্তরের সম্ভাবনা কমে যাবে ইত্যাদি। অথচ উন্মুক্ত বিনিয়োগ নীতির প্রতিকূল প্রভাব ঠেকাতে শিল্পোন্নত দেশ এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলোর উপরোক্ত প্রস্তাবের চাইতে গ্যাটস মোড-৩ এ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অনেক নমনীয় নীতি গ্রহণের সুবিধা দেয়া হয়েছে। এটা প্রণিধানযোগ্য যে, এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট (financial crisis)-এর পরবর্তীতে আইএমএফ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পূর্বের মতো মূলধন হিসাবে মুদ্রাকে বিনিময়যোগ্য করার জন্য চাপ দিচ্ছে না।

এছাড়া বাংলাদেশকে আঞ্চলিক পর্যায়ে বিনিয়োগকারী অনুসন্ধান করতে হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠন করার ফলে বর্ধিত হারে আঞ্চলিক এবং অ-আঞ্চলিক বিনিয়োগ আসবে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক বিনিয়োগ দক্ষিণ এশিয়ায় ঐক্যবদ্ধ একটি শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে শুধুমাত্র প্রণোদনা প্যাকেজ এবং উন্মুক্তকরণের নীতি প্রয়োগই যথেষ্ট নয়। আবার এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টিও সর্বদা প্রমাণিত নয়। বরং তা নিশ্চিত করতে হলে সরকারকে প্রয়োজন অনুসারে বৈদেশিক বিনিয়োগের ধরন এবং গতিপথ নির্ধারণ করার ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে। সবশেষে বর্ধিত হারে বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্যমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি ভালো শাসন ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

ভট্টাচার্য (২০০২), দক্ষিণ এশিয়ায় প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগঃ সম্ভাবনা এবং ঝুঁকিসমূহ, *"সরকার-শিল্প অংশীদারিত্ব : দারিদ্র্য দূরীকরণে সার্কদেশসমূহে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা"* শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের জন্য প্রস্তুতকৃত, ফ্রাইডরিখ ন্যুম্যান ফাউন্ডেশন, মালদ্বীপ এর সাথে মালদ্বীপ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ও সার্ক চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক আয়োজিত : ২৯ সেপ্টেম্বর - ১ অক্টোবর ২০০২।

ভট্টাচার্য ও দেব (২০০৪), উন্নয়ন সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশ অর্থনীতির বহিঃখাত বিশ্লেষণঃ ২০২০ সালকে সামনে রেখে, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগঃ ঢাকা, বাংলাদেশ।

রায়হান (২০০৩), বাংলাদেশে অনুসরিত কর্পোরেট দায়িত্বঃ বেঞ্চমার্ক গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল, সিপিডি সাময়িক প্রত্র সিরিজঃ ৩৫, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগঃ ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০৪), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (২০০৩), দক্ষিণ এশিয়ায় বাণিজ্য সহায়তা এবং অর্থনৈতিক নীতি সংস্কারঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৯-৩০ মার্চ ২০০৩ তারিখে আয়োজিত "দক্ষিণ এশিয়ায় বাণিজ্য সহায়তা এবং অর্থনৈতিক নীতি সংস্কার" বিষয়ক কর্মশালায় উত্থাপিত।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড (২০০২), *প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ জরিপ, ২০০২ সালে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ,* বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ।

সিপিডি (২০০৩), ২০০৩ সালের বাংলাদেশে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশের উপর লিখিত উপদেশ এবং বিশ্ব প্রতিযোগিতাপূর্ণ রিপোর্ট ২০০৩-২০০৪, ৩০ অক্টোবর ২০০৩, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সিপিডি ডাটাবেজ (২০০৬), সিপিডি-আইআরবিডি ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সিপিডি (২০০৫), বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা ২০০৫ (ড্রাফট)।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (২০০৩), অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য জাতীয় নীতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়ন, বাংলাদেশঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

এফআইসিসিআই (২০০৪), এফআইসিসিআই-এ লিপিবদ্ধ সদস্য দেশগুলোতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ জরিপ, ২০০৪, এফআইসিসিআই, বাংলাদেশ।

বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (২০০৩), বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন, বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট (২০০৫), প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন, বিশ্বব্যাংক।

বিশ্ব বিনিয়োগ রিপোর্ট (২০০২), বহুজাতিক কর্পোরেশন এবং রপ্তানি প্রতিযোগিতা, বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন, নিউইয়র্ক ও জেনেভাঃ আঙ্কটাড।

বিশ্ব বিনিয়োগ রিপোর্ট (২০০১), আন্তঃসংযোগ উন্নয়ন, বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন, নিউইয়র্ক ও জেনেভাঃ আঙ্কটাড।

পরিশিষ্টঃ বৈদেশিক বিনিয়োগ বিষয়ে সিপিডি'র প্রকাশনা

Bhattacharya, D. (2002), "*Foreign Direct Investment in South Asia: Promises and Pitfalls*", presented the paper for the roundtable on "Government-Industry Partnership: Sourcing Foreign Direct Investment for Poverty Alleviation in SAARC Countries" held in Paradise Island, Maldives, 29 September – 1 October 2002.

Bhattacharya, D. (2004), *Who benefits from Foreign Direct Investment: Impacts on employment and work conditions - the case of Bangladesh Foreign investors as development aids?* Presented the paper in a workshop on *Foreign Investors as Development Aids?* Organised by Berlin National Working Group Environment and Development-BLUE 21, World Economy, Ecology and Development-WEED and Evangelist Volunteer Service-EED held in Berlin, Germany, 18-19 June 2004.

Bhattacharya, D. (2005), *Introductory Statement to International Civil Society Forum 2005, For Advancing Ldc Interests In The Sixth Wto Ministerial*, Dhaka Sheraton Hotel, 3:00 pm, Monday, 3 October 2005.

Bhattacharya, D. (2005), *State of the Bangladesh Economy in the Fiscal Year 2004-2005*, Second Reading, Centre for Policy Dialogue, Dhaka, pp. 54-58.

Bhattacharya, D. (2005), Team Member of the Study on *Foreign Direct Investment: High Risk, low Reward for Development*, An Accompanying Civil Society Report to the "World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone" (Bangladesh Chapter).

Bhattacharya, D. (2006), *State of the Bangladesh Economy in FY06, Early Signals and Immediate Outlook*, Centre for Policy Dialogue, Dhaka, pp. 32-34.

Bhattacharya, D. with research support of K. M. Rahman and S. F. Rahman (2005), "Bangladesh's Experience with Foreign Direct Investment", in *Foreign Direct Investment: High Risk, Low Reward for Development*, pp. 51-66, Bonn: Church Development Service (EED).

Centre for Policy Dialogue (1995), *Experiences with Economic Reform, A Review of Bangladesh's Development 1995*, Dhaka, pp. 43, 227-229.

Centre for Policy Dialogue (1997), *Growth or Stagnation? A Review of Bangladesh's Development 1996*, Dhaka, pp. 20, 323-326.

Centre for Policy Dialogue (1998), *Crisis in Governance, A Review of Bangladesh's Development 1997*, Dhaka, pp. 122-123.

Centre for Policy Dialogue (2000), *Trends in the Post-flood Economy, A Review of Bangladesh's Development 1998-99*, Dhaka, p. 24.

Centre for Policy Dialogue (2001), *Changes and Challenges, A Review of Bangladesh's Development 2000*, Dhaka, pp. 26-28.

Centre for Policy Dialogue (2002), *Bangladesh Facing the Challenges of Globalisation, A Review of Bangladesh's Development 2001*, Dhaka, pp. 27-28.

Centre for Policy Dialogue (2003), *Employment and Labour Market Dynamics, A Review of Bangladesh's Development 2002*, Dhaka, pp. 25-26.

Centre for Policy Dialogue (2004), *Revisiting Foreign Aid, A Review of Bangladesh's Development 2003*, Dhaka, pp. 27-28.

Istiak, K. M. and K. Mahmudur Rahman (2005), *"Recent Issues of Foreign Direct Investment in LDCs: A case Study of Bangladesh"*, Pakistan Journal of Social Science, Volume 3, Number 2, pp. 324-337, 2005.

Moazzem, K. G. (2005), "*Attracting FDI in South Asia: Need for Policy Changes in view of South East Asia*" presented a paper at IDRC/UNESCAP Consultative Meeting on "Foreign Direct Investment and Policy Challenges: Areas for New Research" held in Bangkok during12-13 May 2005.

Moazzem, K. G. *(*2005), "*Regional Cooperation for Investment in South Asia*" presented a paper in a workshop on "Peace, Democratization and Regional Cooperation in South Asia" organized by International Centre, Goa during 22-26 February 2005

Rahman, K. M.. (2004), *"Foreign Direct Investment in Bangladesh: Prospects and Challenges"*, Bangladesh Institute of Law and International Affairs (BILIA) Journal, 2004.

Shadat, W. B. (2004), "*FDI in Bangladesh: Incentives alone don't work*", Trade and Development Monitor, Vol. 3, No. 1.